দুর্গম পন্থা

অবধূত

দুর্গম পন্থা

পরম কল্যাণীয় শ্রীমান মন্তু

ও

পরম প্রিয় শ্রীমান ভানু

আমার 'দুর্গম পন্থা'র-সাথী দুজনকে

জীবিত বা মৃত, কোনও মানুষের সঙ্গে এই গ্রন্থের কোনও চরিত্রের কিছুমাত্র মিল দেখা গেলে বুঝতে হবে সেটা গ্রন্থকারের সম্পূর্ণ অজান্তে হয়ে বসেছে। তার জন্যে গ্রন্থাকারকে কোনও প্রকারেই দায়ী করা চলবে না

নমঃ সম্ভবায় চ ময়োভবায় চ নমঃ শঙ্করায় চ।
ময়স্করায় চ নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ॥

শিবকে প্রণাম করি, শুভকে প্রণাম করি, শঙ্করকে প্রণাম করি।

প্রণাম করি সেই শিবভূমিকে যার পূর্ব প্রান্তে আদিনাথ, দক্ষিণ প্রান্তে রামেশ্বর, পশ্চিম প্রান্তে কোটেশ্বর, উত্তর প্রান্তে কেদারনাথ। এই ভূখন্ড মঙ্গলদায়িনী সর্বমঙ্গলা, সর্বমঙ্গলাকে প্রণাম করি।

এই পবিত্র ভূমির চতুঃসীমায় শুভ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যাঁরা, তাঁরা শুভসাধক তাঁরা শৈব। তাঁদের আমি প্রণাম করি।

এই শুভস্থানের অধিবাসীরা শুভচিন্তা করেন, শুভংকর বাণী বলেন, শুভবুদ্ধি দান করেন, শুভপন্থা প্রদর্শন করেন। যে মহাশক্তি অর্জন করলে শুভকে করায়ত্ত করা যায়, সেই শুভংকরী শক্তিকে আমি প্রণাম করি।

এই শক্তি কল্যাণী, ইনি সমৃদ্ধিদাত্রী, ইনি সফলতাস্বরূপিণী। এই শক্তিই রাক্ষসী শক্তি, ইনিই কল্যাণকে সমৃদ্ধিকে সফলতাকে গ্রাস করেন। এই শক্তিই ক্ষিতিতত্ত্বকে ধারণ করে আছেন, ইনিই চৈতন্যশক্তি। এই সর্বব্যাপিনী শুভদা শক্তিকে আমি প্রণাম করি।

কল্যাণ্যৈ প্রণতা বৃদ্ধ্যৈ সিদ্ধ্যৈ কুর্মো নমো নমঃ।
নৈঋর্ত্যৈ ভূভৃতাং লক্ষ্ম্যৈ সর্বাণ্যৈ তে নমো নমঃ॥

একদা, অনন্ত কালের কোনও এক অংশে যেখানে ইতিহাস পৌঁছতে পারে না, সেই সময়ে যাঁরা নিখিল বিশ্বের শুভ কামনায় শুভ সাধনের মহাপীঠ এই শুভস্থানের চতুঃসীমায় শিব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাঁরা আজ কোথায়!

এই মহাপীঠে যে যজ্ঞ অনুষ্ঠান দ্বারা দুর্জ্ঞেয়তত্ত্বস্বরূপা দুর্গাকে সন্তুষ্ট করে দুর্জ্ঞেয়তত্ত্বজ্ঞ হয়েছিলেন তাঁরা, সেই যজ্ঞাগ্নি কি অনির্বাণ প্রজ্বলিত রয়েছে আজও!

যে দুর্জ্ঞেয়তত্ত্ব অধিগত হলে সর্ব সংকট থেকে মুক্তিলাভ করা যায়, দুর্গাকে দুর্গপারায়ৈ বলে প্রণাম করা যায়, সেই তত্ত্ব কোথায় লুকোল!

যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করলে অবিরাম পরিবর্তনশীল এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্থির সত্তাটিকে আয়ত্তে আনা যায়,—সেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার বাসনায় শুভ সাধনার এই মহাপীঠে কোথায় কোন্‌খানে যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দেওয়া হচ্ছে! কারা প্রণাম করছে দুর্গাকে সারায়ৈ বলে!

কারা জানবার চেষ্টা করছে সেই সর্বকারিণী সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের হেতুস্বরূপা দুর্জ্ঞেয়তত্ত্ব দুর্গাকে! কারা দুর্গাকে সর্বকারিণ্যৈ বলে প্রণাম করবে!

খ্যাতি কই! কোথায় সেই বিজ্ঞানী যিনি দুর্জ্ঞেয়তত্ত্ব দুর্গার সাধনায় সিদ্ধি লাভ করে খ্যাতি লাভ করেছেন! খ্যাতি লাভ না করলে দুর্গাকে খ্যাত্যৈ বলে

প্রণাম করা যায় কেমন করে!

পরমদুর্জ্ঞেয়া চৈতন্যশক্তিরূপিণী দুর্গাকে সম্যকরূপে যিনি জানতে পারেন, তিনিই তো অখণ্ড জ্ঞানলাভ করেছেন। তাঁর বিশুদ্ধ জ্ঞানেই দুর্গার কৃষ্ণারূপ ধূম্ররূপ ধরা পড়ে। সেই বিজ্ঞানীই বলতে পারেন, যে শক্তি চৈতন্যস্বরূপা, সেই শক্তিই কৃষ্ণা-ঘোর অচৈতন্যস্বরূপা, সেই শক্তিই ধূম্রা-অর্ধ চৈতন্যস্বরূপা।

কোথায় তিনি, সেই পরম বিজ্ঞানী এই শুভ সাধনার মহাপীঠে কোথায় লুকিয়ে বসে চৈতন্যশক্তির সাধনা করছেন! কোথায় কোন্‌খানে দুর্গাকে এই এই মন্ত্রে প্রণাম নিবেদন করা হচ্ছে—

দুর্গায়ৈ দুর্গপারায়ৈ সারায়ৈ সর্বকারিণ্যৈ।
খ্যাত্যৈ তথৈব কৃষ্ণায়ৈ ধূম্রায়ৈ সততং নমঃ॥

অতিসৌম্যা অতিরৌদ্রা দুর্গা কে?

কোন্‌ শক্তির প্রভাবে জগতে স্নেহ দয়া প্রেম করুণা শ্রী সৌন্দর্যের সাধনা বেঁচে রয়েছে! শান্তি আর আনন্দ লাভ করার আশায় বিশ্বমানব ব্যাকুল হয়ে উঠে অপরের ব্যথা বেদনা দূর করবার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে কেন! এই বেদনা-বোধ কেন বেঁচে আছে বিশ্বে, যখন ঠিক তার পাশেই রয়েছে ধ্বংস অত্যাচার অনাচার করার সর্বনাশা বাসনা! যে প্রকৃতি জলপ্লাবন ঝঞ্ঝা ভূমিকম্পে এক দিকে নির্বিচারে ধ্বংস করে চলেছে, সেই প্রকৃতিই আর এক দিকে ভূমিতে শস্য ফলাচ্ছে, শীতল সমীরণে সর্বপ্রাণীকে শান্তি দান করছে, তৃষ্ণার জল রূপে কুলকুল করে বয়ে চলেছে। এই যে অতি-সৌম্যা অতি-রৌদ্রা শক্তি কোথায় এর উৎপত্তি স্থান! কোন্‌ তত্ত্বানুসন্ধায়ী কোথায় বসে কি উপায়ে সন্ধান করছেন দুর্জ্ঞেয়তত্ত্বস্বরূপা দুর্গার এই অতি-সৌম্যা অতি-রৌদ্রা শক্তিটিকে! সেই শক্তিটিকে না জানলে কি করে তিনি বুঝবেন কোন্‌ উপাদানের ওপর জগৎ আশ্রয় করে আছে! যে শক্তির দ্বারা জগতের সমুদয় ক্রিয়া সম্পন্ন হচ্ছে, সেই ক্রিয়াশক্তিকে না জানলে কি করে এই মন্ত্রে প্রণাম করা যায়—

অতিসৌম্যাতিরৌদ্রায়ৈ নতাস্তস্যৈ নমো নমঃ।
নমো জগৎপ্রতিষ্ঠায়ৈ দেব্যৈ কৃত্যৈ নমো নমঃ॥

যা দেবী সর্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা।
নমস্তস্যৈ। নমস্তস্যৈ। নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

যে শক্তি আপন দীপ্তিতে সর্বভূতে বিষ্ণুমায়া স্বরূপা হয়ে বিরাজ করছেন যিনি দর্শন করেন, দর্শনের ফলে এক এবং অদ্বিতীয় সত্তার ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণকে সেই সেই রূপে বোধ করেন, এবং তার ফলে এই এক চৈতন্যশক্তির বিভিন্ন রূপকে বিভিন্নরূপে অনুভব করেন, তাঁকে প্রণাম করছি। বিষ্ণুমায়ার

পঞ্চভূতাত্মক স্থূল রূপকে প্রণাম করছি। বিষ্ণুমায়ার আকাশসম্ভূত দৈবজাত সূক্ষ্ম রূপকে প্রণাম করছি। স্থূল সূক্ষ্মের অতীত বিষ্ণুমায়ার কারণ রূপকে প্রণাম করছি। স্থূল সূক্ষ্ম কারণ এই তিন রূপের অতীত যে রূপ, সেই বিষ্ণু-মায়াকে মন বুদ্ধি বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না, সেই শক্তিই চৈতন্যশক্তির আসল রূপ, তাঁকেও প্রণাম করছি।

খুঁজেছি।

দীর্ঘ সময়, অনেকগুলো দিনরাত, দিনরাতের সমষ্টি অনেকগুলো বছর ব্যয় হয়ে গেছে। স্বল্প মেয়াদ, অনাদি অনন্ত কালের বুকে অতি ক্ষুদ্র একটি বিন্দু। ঐ বিন্দুটি এই জীবন, বিষ্ণুমায়ার পঞ্চভূতাত্মক স্থূল রূপ ধারণের মেয়াদটুকু অত্যন্ত পরিমিত। পরিমিত মেয়াদের অনেকটা অংশ ব্যয় হয়ে গেছে খুঁজতে খুঁজতে। কোথায় কোন্‌খানে সেই সাধনা চলছে, যে সাধনায় বিষ্ণুর যোগনিদ্রা ভঙ্গ হবে!

বিশ্ব ব্যাপিয়া যিনি আছেন, অথবা বিশ্ব যাঁহার মায়াতে অবস্থান করছে, সেই বিষ্ণু যোগনিদ্রায় অভিভূত হয়ে শেষ নাগের ক্রোড়ে সুপ্ত। বিশ্বকে বিশ্ব বলে চেনা যায়, বিশ্বে যখন প্রাণ থাকে। বিশ্বের প্রাণ বিষ্ণু, সৃষ্টির বীজ-সমষ্টিকে শয্যারূপে বিছিয়ে তার ওপর শয়ন করে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় নিদ্রিত রয়েছেন। এই যে নিদ্রা যা চৈতন্যশক্তিকেও আবরিত করে রেখেছে, এই মহাশক্তি নিদ্রার স্তুতি কোথায় হচ্ছে!

একদা এই শিবভূমিতে বিশ্বের হিত কামনায় এক এবং অদ্বিতীয়া পরমা-শক্তির সাধনা করে সৃষ্টিতত্ত্বের মূল যে প্রাণ, সেই প্রাণকে পর্যন্ত জেনেছিলেন যে সাধকরা, সেই প্রাণকে সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন যাঁরা, তাঁরা আজ কোথায়! কোথায় কোন্‌খানে এই মন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছে প্রাণকে জাগাবার জন্যে—

ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং হি বষট্‌ কারঃ স্বরাত্মিকা।
সুধা ত্বমক্ষরে নিত্যে ত্রিধামাত্রাত্মিকা স্থিতা॥
অর্ধমাত্রাস্থিতা নিত্যা যানুচ্চার্যা বিশেষতঃ।
ত্বমেব সা ত্বং সাবিত্রী ত্বং দেবী জননী পরা॥

এই মহামন্ত্রের মধ্যে কি সংকেত লুকনো রয়েছে!

খুঁজেছি, খুঁজে ফিরছি আসমুদ্রহিমাচল এই শিবভূমি। স্বপ্নমেয়াদের অনেকটা ব্যয় হয়ে গেছে।

ব্রহ্মচারী সনাতন শর্মাও খুঁজছিলেন। ভারতবর্ষের সনাতন আত্মাটিকে খুঁজে বার করার দুষ্কর ব্রত স্কন্ধে নিয়ে তিনি সদাই জপ করতেন—

যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি।

যা শুনলে যা শোনা যায় না তাও শোনা যায়, যা চিন্তা করা যায় না তাও চিন্তা করা যায়, যা জানা অসাধ্য তাও জানা হয়ে যায়, সেই অশ্রুতপূর্ব অজ্ঞাত-পূর্ব অচিন্ত্যপূর্ব চৈতন্যময় সত্তাকে ভারতের সনাতন চৈতন্য বলে জ্ঞান করতেন ব্রহ্মচারী। তাই তিনিও থামতে পারেন নি, খুঁজে ফিরেছেন। এত বড় দেশ, দেশের অগণিত তীর্থ আমরা দু জনে ঢুঁড়ে ফিরেছি।

কিন্তু—

দিবান্ধাঃ প্রাণিনঃ কেচিৎ রাত্রাবন্ধাস্তথাপরে।
কেচিদ্দিবা তথা রাত্রৌ প্রাণিনস্তুল্যদৃষ্টয়ঃ॥

অন্ধের খোঁজায় কিবা আসে যায়!

দৃষ্টির সামনে অর্গল আবদ্ধ করে ভেতরে খোঁজা হয় নি, বাইরে খোঁজা হয়েছে। আর যে কীলকটিতে নিজেকে বেঁধে রেখে কীলকের চতুষ্পার্শে পাক খেয়েছি, সেই কীলকটি উৎপাটন করা হয় নি। কাজেই খোঁটায় বাঁধা গরু তার গলায় বাঁধা দড়ির সীমার বাইরে যেতে পারে নি। সেখানে কি আছে খোঁজাও হয় নি।

তবু আমরা দু জনে খুঁজেছি। সনাতন আর আমি অতি দুর্গম পন্থায় পা দিয়েছিলাম। আজও সেই দুর্গম পন্থায় ঘুরছি। খোঁজা এখনও শেষ হয় নি। আরও বাকী আছে। সেই শক্তি সর্বজীবে ইন্দ্রিয় ও ভূতসমূহের অধিষ্ঠাত্রীরূপে পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন। এইটুকু যখন জেনেছি, তখন এই দুর্গম পন্থায় চলার শেষ কোথায়!

প্রণাম করছি সেই শক্তিকে—যিনি

ইন্দ্রিয়াণামধিষ্ঠাত্রী ভূতানাঞ্চাখিলেষু যা।
ভূতেষু সততং তস্যৈ ব্যাপ্তিদেব্যৈ নমো নমঃ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু ছায়ারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ। নমস্তস্যৈ। নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

প্রথম

মনে পড়ছে ঘোষাল মশাইকে।

ঘোষাল মশাই কোথায় এখন! এখনও কি তিনি তাঁর সেই নাতনী আর নাতজামাইটিকে সঙ্গে নিয়ে তীর্থ করে বেড়াচ্ছেন! অসম্ভব, ঘোষাল মশাই নিশ্চয়ই এতদিনে এ পারের তীর্থের মায়া কাটিয়ে ও পারের তীর্থে আশ্রয় পেয়েছেন। এখন যদি আবার নতুন করে তীর্থদর্শন করতে বেরিয়ে পড়ি, তা হলে ঘোষাল মশাইকে কিছুতেই সঙ্গী পাব না। সঙ্গীর প্রয়োজন ঘোষাল মশায়ের একদম ফুরিয়েছে।

সেদিন কিন্তু ফুরয় নি, স্টীমারে পদার্পণ করেই আমাকে আর সনাতনকে খুঁজে বার করতে অতি অল্পই দেরি হয়েছিল ঘোষাল মশায়ের। তার পর সেই বিদকুটে ব্যাপার, যার ফলে সেবার আদিনাথ দর্শনটাই কপালে ঘটল না। আদিনাথকে পাশ কাটিয়ে অয়স্কান্তের আকর্ষণে কক্সবাজারে গিয়ে উপস্থিত হলাম। আদিনাথ অবশ্য তার পরের বার এবং তার পর অনেকবার দর্শন করা হয়েছে। দর্শনের ফলে যথাবিহিত পাপস্খালনও হয়েছে নিশ্চয়ই, কিন্তু ঘোষাল মশায়ের দর্শনলাভ আর একটিবার ঘটে নি। ঘটে নি বলে অয়স্কান্তের সঙ্গে সম্পর্ক চুকে গেছে। ঘোষাল মশায় ভিন্ন কার এমন ক্ষমতা আছে যে অয়স্কান্ত চিনিয়ে দেবে!

ঘোষাল মশাইকে পেয়েছিলাম বলে অয়স্কান্তকে চিনতে পেরেছিলাম। আগে তাই ঘোষাল মশায়ের কথা বলি।

ভারতবর্ষের বুকের ওপর দিয়ে পুবে পশ্চিমে একটি সরল রেখা টানলে দেখা যাবে যে পুব সাগরের তীরে আদিনাথ আর পশ্চিম সাগরের তীরে কোটেশ্বর এই দুটি তীর্থ সরল রেখাটির দুই প্রান্তে বসে আছে। আদিনাথ দর্শন করে যদি কোনও মহাপুরুষ চক্ষু বুজে সোজা পশ্চিমমুখো হাঁটতে শুরু করেন এবং কিছুতেই কোনও দিকে না ঘোরেন ফেরেন, তা হলে একদা তিনি কোটেশ্বর মহাদেবের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে চক্ষু উন্মীলন করতে পারেন। অবশ্য যদি তিনি রাস্তাঘাট কোনও কিছুর পরোয়া না করেন অর্থাৎ আকাশচারী হন তবেই এটা সম্ভব। আর আমার মত নিতান্ত সাধারণ মানুষের বেলায় আদিনাথে গিয়ে পৌঁছতেই আদ্যশ্রাদ্ধ ভোজনের যোগাড় হয়েছিল।

ছোট্ট একখানি স্টীমার। স্টীমার ঠিক নয়, প্যাসেঞ্জার-বহা স্টীমার বলতে আমরা বুঝি সেগুলোকে, যেগুলো খুলনা বরিশাল গোয়ালন্দে যাওয়া আসা করে। এ স্টীমার সে রকম নয় মোটেই। কলকাতা বন্দরে বড় জাহাজ টানবার

জন্যে যে রকম স্টীমার জাহাজের সামনে পেছনে দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকে, যাকে বন্দরের ভাষায় টাগ্‌বোট বলা হয়, এ হচ্ছে সেই জাতীয় ব্যাপার। গোয়ালন্দ খুলনার স্টীমার চলে বড়লোকের বাড়ির ভারী গতরের গিন্নীবান্নীর মত গজ-গামিনী চালে, আর সে স্টীমার চৌরঙ্গী পাড়ার চঞ্চলা চন্দ্রাননা চম্পকবরণী-দের মত নাচতে নাচতে যায়। তাই তার শরীর হালকা, গড়ন একটু ছিমছাম ধরনের, আর শক্তি—ঐ "ফুটানিকা ডিব্বা" বইবার মত !

মাত্র পনেরো-বিশ জন যাত্রী নিয়ে রওয়ানা হল চাটগাঁ থেকে। তার মধ্যে তীর্থযাত্রী আমরা পাঁচ জন। পাঁচ জনের মধ্যে প্রথম এবং প্রধান হলেন ঘোষাল মশাই। এক-এক জন মানুষ আছেন, আছে বললে তাঁদের খাটো করা হয়, মানে কিছুতেই তাঁদের আপনি আজ্ঞে ছাড়া ছোট কিছু বলতেই পারা যায় না। এ'রা আলাপ-পরিচয়ের ধার ধারেন না, যে কোনও স্থানে যে কোনও পরিস্থিতির মধ্যে চুম্বকের মত আকর্ষণ করতে পারেন। দশ জনের মধ্যে এক জন নন এ'রা, দশ জন ছাড়া আলাদা এক জন। যে এক জনের মুখের দিকে দশ জনে না তাকিয়ে পারে না। যে এক জনের বাক্য শোনার জন্যে দশ জনের কর্ণ 'উৎকর্ণ' হয়। যে এক জন দশ জনের আশঙ্কা উদ্বেগ কেবল মাত্র স্বচ্ছ চাউনি আর মুখের হাসি দিয়ে হরণ করতে পারেন। ঘোষাল মশাই সেই রকম এক জন দশাসই পুরুষ। স্টীমারে চড়লেন মহা-শোরগোল তুলে। শোর-গোল তোলার জন্যেই বোধ হয় নাতনী আর নাতজামাইকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছেন। সে দুটি প্রাণী স্টীমারখানার চেয়ে অন্ততঃ দশগুণ বেশী লাফাতে পারে, আর স্টীমার যার বুকে ভাসছে, সেই কর্ণফুলীর চেয়ে এক শ গুণ বেশী হাসতে পারে, কলকল করতে পারে, ছলছল করতে পারে।

স্টীমারে পদার্পণ করেই ঘোষাল মশাই সাধু ভাষা প্রয়োগ শুরু করলেন।

"ভো ভো অপোগণ্ড অপোগণ্ডিনী। অতটা ঝুঁকিও না ওধারে। আমার কানের কাছেই তোমরা প্রেমালাপ চালাইতে পার। আমি শুনিতেও পাইব না। কারণ এখন পরলোকের চিন্তায় মনোনিবেশ করিয়াছি। ওভাবে উপরার্ধ ঝুলাইয়া দিয়া প্রেম সম্বন্ধে গবেষণা চালাইতে চালাইতে শেষে ডিগ্‌বাজি খাইয়া প্রেম-সাগরে পড়িয়া মরিবে। এধারে আইস, খোঁজ লইয়া দেখ, আর কে কে আমাদের মত সেই মগের মুল্লুকে তীর্থ করিতে চলিয়াছে।"

অতঃপর আমাকে আর ব্রহ্মচারী সনাতন শর্মাকে খুঁজে বার করতে ঘোষাল মশায়ের একটুও কষ্ট হল না। ও'রা তিন জন আর আমরা দু জন ছাড়া বাকী সবাই মগ এবং মগানী বা মগী। মেয়েপুরুষ সকলেই লুঙ্গি পরে আছে চুরুট টানছে আর একটু যেন নাকী সুরে কথা বলছে। পরে অবশ্য বুঝে-ছিলাম, মোটেই নাকী সুরে কথা বলে না ওরা। ওদের ভাষায় অত্যধিক পরিমাণ ঙ আর ঞ থাকার দরুন কথাগুলো ও-রকম নাকী সুরে বেরোয়।

ওরা থাকে ওধারেই।

সাগর, সাগর-ছোঁয়া পাহাড়, পাহাড়-ভরা জঙ্গলের মধ্যে ওরা চঙ্ বানিয়ে থাকে। চঙ্ কথাটির সঠিক অর্থ কি তা বলা শক্ত। বানিয়াচঙ্ নামে একটি স্থান আছে, নামটি অনেকেরই পরিচিত। মনে হয় স্থানটির নাম বানিয়াচঙ্ এই জন্যেই রাখা হয়েছিল, যেহেতু কোনও সময় ওটা ছিল বেনেপটি। অর্থাৎ একচেটে বেনেদের বসবাস ছিল ওখানে। কিন্তু মগ বাসা বাঁধে চঙের ওপর। বাঁশ দিয়ে উঁচু মাচা বানায়, তার ওপর খাড়া করে বাঁশের ঘর। মগের সংসার সেই মাচার ওপর বাঁশের কেল্লায়। মগ যাকে চঙ্ বলে তাকেই বোধ হয় আমরা টঙ্ বলে থাকি। শুধু ঙ আর ঞ নয়, চ অক্ষরটির উচ্চারণও বেশ দরাজ ভাবে করা হয় কিনা মগাই ভাষায়। কাজেই আমাদের টঙ্ চাটগাঁ পার হয়ে চঙ্ হয়ে দাঁড়িয়েছে কিনা, তাই বা কে বলতে পারে।

চাটগাঁ থেকে আদিনাথ, কতটুকুই বা দৌড়! সকালে বেরিয়ে দিনে দিনেই পৌঁছে যাওয়া যায়। এই দৌড়ের মাঝে অনেকবার থামে স্টীমার। কর্ণফুলীর মুখের কাছে ছোট ছোট দ্বীপের মত অনেক ঠাঁই আছে, যেমন পদ্মার মাঝে আছে চর। কিন্তু চর বললে বোঝায় বালি বা বেলে মাটি, পাথরের চাঙড় কিছুতেই বোঝায় না। কর্ণফুলীর মুখে জলের ভেতর থেকে দাঁত বার করে ভেসে উঠেছে কতকগুলো কিম্ভূতকিমাকার পাথুরে জানোয়ার। স্টীমার থামে সেগুলোর পাশে। থামে না মোটেই, নাচতে নাচতে আসছিল, হঠাৎ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নাচতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্র গঠনের সব নৌকো এসে ছেঁকে ধরল স্টীমারখানাকে। তখন নাচন্ত স্টীমার থেকে দোলন্ত নৌকোয় ঝুলন্ত অবস্থায় যাত্রীরা ঝাঁপিয়ে পড়ল তাদের মালপত্র নিয়ে। নিমেষের মধ্যে নৌকো-গুলো ছুটে চলে গেল চক্ষের আড়ালে, মানে এপাড়ায় ওপাড়ায়। আবার বহু যাত্রী উঠেও এল টপাটপ্ করে সেই অবস্থায় নৌকো থেকে স্টীমারে। এতটুকু অসুবিধে হল না কারও। ওদের অনর্গল হাসি আর অবিরাম অনুনাসিক বকাবকি শুনে মনে হল এতটুকু অস্বাচ্ছন্দ্য বা অসুবিধে বোধ করছে না কেউ এ ভাবে উঠতে নামতে।

কর্ণফুলীর সন্তান ওরা। পাগলী মেয়ে কর্ণফুলী যেমন দুরন্ত তেমনি ছটফটে। ওর সন্তানরা শান্তশিষ্ট হবে কি করে।

প্রমাদ গণলাম আমরা, চন্দ্রশেখর পর্বতে শম্ভুনাথ দর্শন করে আমরা চলেছি আদিনাথ দর্শনে। আমরা তীর্থপিয়াসী।

"শম্ভুনাথশ্চ চন্দ্রনাথশ্চন্দ্রশেখরপর্বতে।
আদিনাথঃ সিন্ধুতীরে কামরূপে মহেশ্বরঃ॥"

সিন্ধু তখনও অনেক দূরে। তখনও আমরা কর্ণফুলীর মধ্যে। এখানেই

যদি নামতে উঠতে এই অবস্থা হয় তা হলে খাস সিন্ধুতীরে কি রকম দাঁড়াবে আমাদের দশা, সেটা কল্পনা করতে গিয়েই আমরা বেহাল হয়ে পড়লুম। ঘোষাল মশায় তো তারস্বরে শিবনাম নিতে শুরু করলেন। নাতনী নাত-জামায়ের সঙ্গে তিনিও পাপস্খালনের আশায় চলেছেন আদিনাথে। কিন্তু ও'র সাথী দুটি যে কি উদ্দেশ্য নিয়ে চলেছেন তা বোধ হয় স্বয়ং শিবও জানেন না। বন্দুক দূরবীন ক্যামেরা ফ্লাস্ক ইত্যাদি ইত্যাদি সহ নিখুঁত সাহেবী-পোশাক-পরা নাতজামাইটি আর চশমা ক্ষুদে রিস্টওয়াচ উঁচু গোড়ালির জুতো সহ মেমসাহেবী ঢঙের শাড়ি পরা, গালে ঠোঁট হাত পায়ের নখে রঙ মাখা তাঁর সহধর্মিণীটি যে উদ্দেশ্যেই সেই স্টীমারে চড়ে থাকুন, পরলোকের পাথেয় অর্জনের উদ্দেশ্যে যে তীর্থ করতে যাচ্ছেন না, এটা সর্বশ্রেষ্ঠ অর্বাচীনও বুঝবে। ঘোষাল মশায় অবশ্য মাঝে মাঝে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন ওদের পর-লোকের কথা। ফলে স্টীমার সুদ্ধ মানুষ অস্থির হয়ে উঠছে দু জনের হাসির ঝাপটায়।

খুবই রেগে গিয়ে শেষে গালমন্দ জুড়ে দিলেন ঘোষাল মশাই।

"এই বেহেড বেশরম বেল্লিক বেআক্কেল বেআদব দম্পতি, পুনরায় যদি তোমাদের ঐ অশ্রাব্য বেলেল্লা হাসি মদীয় পবিত্র কর্ণকুহরে প্রবেশ ক'র, তবে আমি অবিলম্বে সাগরজলে ঝম্পপ্রদানপূর্বক তোমাদের ব্রহ্মহত্যার দায়ে নিক্ষেপ করিব। তাহাতে তোমরা অনন্তকাল নরকবাস করিয়া নরকসুদ্ধ মানুষকে অস্থির করিবার সুযোগ লাভ করিবে।"

শুনেই নাতনীটি সজোরে এক ধমক লাগালেন তাঁর উনিকে।

"এই—ফের হেসো না বলছি, ভাল হবে না। দেখছ না দাদু চটেছেন।" বলে দৌড়ে এসে দাদুর কাঁধে মুখ গুঁজে হাসি চাপবার জন্যে হাসির চোটে ফুলে ফুলে কাঁপতে লাগল।

নাতজামাইটি তৎক্ষণাৎ চুপ। তাড়াতাড়ি ফ্লাস্ক থেকে এক পাত্র কফি ঢেলে দাদাশ্বশুরের সামনে এগিয়ে ধরে ভক্ত গরুড় বনে গেল একেবারে। অতি বিনীতভাবে নিবেদন কর'ল—"সেবন করুন। ঝম্পপ্রদানের পূর্বে শেষ পাত্রটি টেনে নিন দাদু। নিয়ে বেশ মৌতাত জমিয়ে একটা চুরুট ধরান। তার পর ঝাঁপিয়ে পড়ুন জলে শুধু আণ্ডারওয়ার পরে। ততক্ষণে বিনু ওর সুইমিং কস্‌টিউমটা পরে ফেলুক—আমিও প'র নিই আমারটা। বেশ সাঁতরাতে সাঁতরাতে যাওয়া যাবে এই গাধা বোটটার সঙ্গে।"

দাদু নেহাতই নিঃস্পৃহতার সঙ্গে কফি-পাত্রটি গ্রহণ করে চুরুটটি মুখে লাগিয়ে বললেন—"নাও, এবে এই তাম্রকূট শলাকায় অগ্নিসংযোগ কর।"

তৎক্ষণাৎ লেগে গেল আর এক চোট হুড়োহুড়ি। লাফিয়ে উঠল নাতনী। "এই খবরদার—আমি জেবলে দোব দেশলাই।" বলেই দেশলাইটা কেড়ে নেবার

জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল স্বামীর হাতের ওপর। তুলকালাম কান্ড লেগে গেল একেবারে। সে পর্ব থামাতে দাদুকে পুনরায় সাধুবাক্য প্রয়োগ করতে হল।

"ওরে শৃগাল-শৃগালী যুগল—কেন চুলোচুলি করিয়া মরিতেছ? অবিলম্বে তোমাদের এই হীন খেয়োখেয়ি বন্ধ কর। দাও, ঐ শলাকার বাক্স আমার হস্তে, অবিলম্বে অর্পণ কর। তোমাদের অগ্নি আমি স্পর্শ করিব না।"

তাঁর কথা শেষ হবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে আচমকা এক প্রকান্ড ধাক্কায় যাত্রীরা ছিটকে পড়ল এ ওর ঘাড়ে। সেই সঙ্গে কানে গেল উৎকট একটা আওয়াজ, প্রচন্ড জোরে যেন ঘষড়ানি লাগছে দুটো ভারী জিনিসের! হাত-পা-মুখ-মাথার চোট অগ্রাহ্য করে কোনও রকমে খাড়া হয়ে সভয়ে দেখতে লাগলাম চারিদিকে। হল কি!

স্টীমারের সারেং খালাসীদের মুখভাবের বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয় নি। ঢং ঢং টিং টিং নানা জাতের ঘণ্টা বাজছে ইঞ্জিন ঘরে। সেই রকম ঘষড়ানির শব্দও চলেছে সমানে। মগ-মগানীরা মহাস্ফূর্তিতে হেসে গড়িয়ে পড়ছে এ ওর ঘাড়ে। ব্রহ্মচারী সনাতন শর্মা বিশুদ্ধ হিন্দীতে জানি না কাকে গালমন্দ দিচ্ছেন আর নিজের ফুলেওঠা কপালে হাত ঘষছেন। নাতনীটির চোখ মুখ থেকে দুষ্টুমি গেছে উবে। সে দাদুকে জড়িয়ে ধরে সভয়ে চাইছে চারিদিকে। দাদু চক্ষু বুজে ঠোঁট নাড়ছেন। আর নাতজামাইটি চোখে দূরবীন লাগিয়ে আদিগন্ত জলের বুকে কি দেখছেন তা তিনিই জানেন।

দেখবার মত কোথাও কিছু নেই। ডাইনে বাঁয়ে সামনে পেছনে জল, শুধু জল, বাঁদিকে অনেক দূরে দিগন্ত ছুঁয়ে একটা কালো রেখা চলে গেছে উত্তর থেকে দক্ষিণে। এ ছাড়া কোনও দিকে কোথাও আকাশ আর জল ছাড়া দেখবার কিছু নেই।

হঠাৎ ঘষড়াবার আওয়াজটা থেমে গেল। আবার নাচতে লাগল আমাদের স্টীমার। মগ-মগানীরা আনন্দে আঁই আঁই করে উঠল। এক জন বুড়ো সারেং না খালাসী আমাদের কাছে এসে জানালেন যে ভাববার কিছু নেই। এ রকম হয়। হয় বলেই এই স্টীমারগুলো এত হালকা, এত শক্ত আর এত ক্ষমতাশালী। জলের তলায় একটা পাথর-বালির পাহাড় পড়েছিল। ঘষড়াতে ঘষড়াতে সেটা পার হয়ে এল স্টীমার। ঘাবড়াবার মত ব্যাপার নয় মোটেই।

হয়তো তা নয়ও। এ পথের যাঁরা হামেশার পথিক, তাঁরা এই সাগরের বুকে ডুবন্ত পাথরের ওপর দিয়ে হেঁচড়ানো ব্যাপারটাকে বেশ মজা করে উপভোগ করলেন বলেই মনে হল। স্টীমারের তলাটা নাকি এমন ধরনের আর এমন মজবুত করে তৈরী যে কিছুতেই ফেঁসে যাবে না। এবং স্টীমারখানাও এমন জাতের যে কোনও মতেই ডুববে না। এ সবই নিশ্চয় খাঁটী সত্যি কথা। কিন্তু এতগুলো শক্ত শক্ত সত্যি কথা শুনেও তীর্থযাত্রী পাঁচ জনের মানসিক অবস্থার

কিছুমাত্র উন্নতি হল না। হাসি ঠাট্টা হুল্লোড় ভুলে নাতনী বিনু দাদুর গা ঘেঁষে বসে রইল। আর নাতজামাইটি একটু ওধারে গিয়ে আড়ালে দাঁড়িয়ে সিগারেটের পর সিগারেট পোড়াতে লাগল। ব্রহ্মচারী সনাতন শর্মা রুদ্রাক্ষের মালা ঘোরাতে লাগলেন ও পাশ ফিরে বসে।

ঘোষাল মশাই শিবনেত্র হয়ে শুরু করলেন—

"শিবস্মরণমাত্রেণ সর্বারিষ্টাঃ পলায়িতাঃ।
সর্বসঙ্কটমুত্তীর্য কল্যাণং লভতে নরঃ॥"

একটু পরেই তাঁর নাতনীর অপূর্ব কণ্ঠস্বর শোনা গেল—

"গঙ্গাতরঙ্গরমণীয়-জটাকলাপং
গৌরী-নিরন্তর-বিভূষিত-বামভাগম্।
নারায়ণপ্রিয়মনঙ্গমদাপহারং
বারাণসীপুরপতিং ভজ বিশ্বনাথম্॥"

কোন এক জাদুমন্ত্র বলে সমস্ত আবহাওয়াটাই গেল বদলে। বাচাল বেশরম বেহেড নাতনীটির চোখে মুখে ফুটে উঠল এক অপূর্ব স্নিগ্ধশ্রী। ঠোঁট গালের রঙ, ফিরিঙ্গী ধাঁচের সাজপোশাক আর ভুতুড়ে প্রগল্ভতার ভেতর থেকে শান্ত-শিষ্ট বাঙালী মেয়ের ব্রতচারিণী মূর্তিটি বেরিয়ে এল। দাদুর গা ঘেঁষে বসে সে দাদুর সঙ্গে গলা মিলিয়ে গাইতে লাগল—

"বাচামগোচরমনেকগুণস্বরূপং
বাগীশবিষ্ণুসুরসেবিত-পাদপীঠম্।
বামেন বিগ্রহবরেণ কলত্রবন্তং
বারাণসীপুরপতিং ভজ বিশ্বনাথম্॥"

তার পর যা ঘটল তা আরও অদ্ভুত আরও অবিশ্বাস্য। সাহেবী সাজ-পোশাক সুদ্ধ নাতজামাইটি ঘোষাল মশায়ের সামনে বসে পড়লেন পা মুড়ে। তার পর চোখ বুজে মিলিয়ে দিলেন নিজের কন্ঠ দাদু নাতনীর কন্ঠের সঙ্গে।

"ভূতাধিপং ভুজগভূষণভূষিতাঙ্গং
ব্যাঘ্রাজিনাম্বরধরং জটিলং ত্রিনেত্রম্।
পাশাঙ্কুশাভয়বরপ্রদ-শূলপাণিং
বারাণসীপুরপতিং ভজ বিশ্বনাথম্॥"

স্টীমার সুদ্ধ মানুষ থ একেবারে। স্টীমারখানাও যেন বেশ শান্তশিষ্ট ভাবে ছুটতে লাগল। কি থেকে কি দাঁড়িয়ে গেল হঠাৎ!

কর্ণফুলীর দুরন্তপনা আর নেই, ঘোলাটে জলের মাথায় সাদা ফেনা আর দেখা যাচ্ছে না। দুলছি বটে আমরা তখনও কিন্ত সে দোলায় তোলপাড় করছে না বুকের ভেতর। কেমন যেন ঘুম এসে যাচ্ছে।

জলের রঙ্ নীল। নীল জলে আর নীল আকাশের কোথাও ছিটেফোঁটা ময়লা নেই। স্টীমারের গায়ে জল এসে আছড়ে পড়ছে। বেশ তাল রেখে এক নাগাড়ে ঝপ ঝপ ঝপ ঝপ আওয়াজ হচ্ছে। মগ-মগানীদের হাসি হুল্লোড় ফষ্টিনষ্টি সব ঠান্ডা। সকলে কান পেতে শুনছে দাদু নাতনী নাতজামাইয়ের মিলিত কণ্ঠধ্বনি। তাঁরা গাইছেন—

"আশাং বিহায় পরিহৃত্য পরস্য নিন্দাং
পাপে রতিঞ্চ সুনিবার্য মনঃ সমাধৌ।
আদায় হৃৎকমলমধ্যগতং পরেশং
বারাণসীপুরপতিং ভজ বিশ্বনাথম॥"

॥ দুই ॥

আত্মনিষ্ঠ সনাতন শর্মা খুঁজে ফেরেন একটি আত্মা। নিজের বা অন্য কোনও প্রাণীর নয়, তিনি খুঁজছেন ভারতবর্ষের সনাতন আত্মাটিকে। এই পবিত্র কর্ম যখন তিনি শুরু করেন তখন তাঁর বয়স ছিল অল্প, শরীরে ছিল শক্তি, ঠ্যাং দুখানা ছিল আস্ত। এখন তাঁর বয়স গড়াচ্ছে ভাঁটির টানে, শরীরে নেই তেজ, আধখানা ঠ্যাং পর্যন্ত গেছে। কবে নাকি কামরার মধ্যে স্থান না পেয়ে ট্রেনের পা-দানিতে দাঁড়িয়ে তিনি ভ্রমণ করছিলেন, কি জানি কি করে তখন তাঁর হাতের মুঠি বেইমানি করে বসল, ফলে খোয়া গেল ডান পায়ের হাঁটু থেকে নীচেকার সবটুকু। তাতেও কিছু গেল-এল না, ভারতের সনাতন আত্মাটিকে খুঁজে বার করার দুষ্কর ব্রতে ক্ষান্ত হলেন না ব্রহ্মচারীজী। বাড়ার মধ্যে বাড়ল দুই উপসর্গ, দুই বগলের নীচে দুখানি ঠেঙা গুঁজে ঠকাস ঠকাস শব্দ করে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। আর মনে মনে সর্বক্ষণ জপতে লাগলেন—

"যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি।"

যা শুনলে যা শোনা যায় না তাও শোনা হয়, যা চিন্তা করা যায় না তাও চিন্তা করা যায়, যা জানা অসাধ্য তাও ষোল আনা জানা হয়ে যায়।

সেই অশ্রুতপূর্ব অচিন্তিতপূর্ব এবং অজ্ঞাতপূর্ব ব্যাপারটিকে সনাতন ভারতের চৈতন্যময় সত্তা বলে মনে করেন ব্রহ্মচারীজী। সেই ব্যাপারটিকে ঠিক ভাবে পাকড়াও করবার জন্যে দেড়খানা ঠ্যাং নিয়ে বগলে দুই ঠেঙা গুঁজে এত বড় দেশটার প্রতিটি আনাচ-কানাচ ঠেঙিয়ে বেড়ান।

ঠ্যাং আধখানা না থাকার দরুনই বোধ হয় ব্রহ্মচারীজী বরদাস্ত করতেন আমার সঙ্গ। অনেক সময় পাহাড়-পর্বতে চড়তে, খানা-খন্দ ডিঙোতে বা রেলে-স্টীমারে নামতে উঠতে অন্য একজনের সাহায্য তাঁর প্রয়োজন হত। আদি-নাথে পৌঁছে তাঁকে নিয়ে নামাটা কি কায়দায় সুসম্পন্ন করব, বুঝে উঠতে

পারলাম না। স্টীমার থামবে বটে, কিন্তু নাচন থামবে না নিশ্চয়ই। নিজে যে কোনও উপায়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারব ডাঙায়, কিন্তু আর এক জনকে পিঠে নিয়ে ঝাঁপানো তো কিছুতেই সম্ভব নয়। সারেং-খালাসীদের সাহায্য নেওয়া ভিন্ন উপায় নেই। সেই ব্যবস্থা করার জন্যে বুড়ো সারেংটির কাছে গিয়ে বসলাম।

এধারে কি করে জানি না, তর্ক জমে উঠল ঘোষাল মশাই আর ব্রহ্মচারীজীর মধ্যে। সারেং সাহেবের কাছ থেকে ফিরে এসে ব্যাপার দেখে বেশ ঘাবড়ে গেলাম। ঐ একটি কর্ম কখনও কোনও কারণে আমি করতাম না ব্রহ্মচারীজীর সঙ্গে। কিছুতেই তাঁর সনাতন আত্মানুসন্ধান ব্যাপারটি নিয়ে মাথা ঘামাতাম না। দেশ দেখা, দেশটার গাছ-পালা, পাহাড়-পর্বত, আকাশ-বাতাস, মানুষ-পশু-পাখী ইত্যাদি সব কিছুর সঙ্গে আলাপ পরিচয় করা, এই ছিল আমার নেশা। তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াতাম স্রেফ স্থানগুলো দেখার আনন্দে। পাপ-পুণ্য, লাভ-লোকসান এই সমস্ত হিসেব-নিকেশ মনের কোণেও উদয় হয় নি কখনও। এতবড় দেশটা জুড়ে এতগুলো তীর্থ যাঁরা বানিয়ে রেখে গিয়েছেন তাঁদের ওপর মনটা কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠত। এ দেশের মানুষ আমরণ মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াতে পারে, অজানা অচেনা স্থানে পৌঁছে সেখানকার অত্যদ্ভুত দৃশ্য দেখে বার বার তাজ্জব বনতে পারে। কিছুতেই ফুরোবে না নতুন জায়গায় যাওয়ার রোমাঞ্চ। মাত্র গোটা দশ-বিশ তীর্থ থাকত যদি এ দেশে, তা হলে কি মুশকিলেই না পড়তাম আমরা! দু-এক বছর ঘুরলেই তীর্থভ্রমণ কর্মটি সমাধা হয়ে যেত। তার পর সারাটা জীবন ঘরের কোণে বসে শুধু দিন গুণে দিন কাটানো ছাড়া আর কিছুই করার থাকত না।

কপাল জোরে এমন এক দেশে জন্মেছি যে বছরের পর বছর ঘুরে বেড়ালেও দেশের তীর্থগুলো ফুরোবে না। এই কারণেই আমি তীর্থস্রষ্টাদের অকপটে শ্রদ্ধা করি। দেশের মানুষকে জীবনভোর ঘুরে বেড়াবার সুযোগ দেওয়া ছাড়া অন্য কিছু অভিসন্ধি ছিল তীর্থস্রষ্টাদের মগজে, এ আমি জানতামই না ব্রহ্মচারীজীর সঙ্গে পরিচয় হবার আগে। তাঁর কাছেই প্রথম শুনি যে পবিত্র ভারতভূমির পবিত্রতম আত্মা নাকি লুকিয়ে আছে ভারতের তীর্থ স্থানগুলিতে। সেই আত্মার পরিচয় লাভ করাই তীর্থভ্রমণের একমাত্র সার্থকতা। শুনে প্রথমে চমকে উঠেছিলাম। চমকালেও কিন্তু তর্ক করতে যাই নি। আমি জানতাম, ব্রহ্মচারীজী এমন এক সুমহান ব্রতে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছেন যে সে ব্রতের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ প্রকাশ করলে মহা অনর্থ ঘটবে। পাছে কারও সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে হয়, এই ভয়ে সহজে মুখ খুলতেন না ব্রহ্মচারীজী। পবিত্র বিষয়ের পবিত্র আলোচনা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাতাহাতি হওয়াটা নিশ্চয়ই পবিত্রতম কর্ম নয়।

সেই প্রথম দেখলাম ব্রহ্মচারী সনাতন শর্মা চুপ করে মুখ বুজে শুনছেন অপরের বক্তব্য। তর্ক করছেন অবশ্য মাঝে মাঝে, কিন্তু সে তর্কে ঝাঁজ নেই তেমন। তুমি বেটা বোঝ কোন্ কচু—এই জাতের ধমকের আমেজ নেই ব্রহ্মচারী-জীর গলায়। তার বদলে প্রকৃত জিজ্ঞাসুর সুর শোনা গেল।

জিজ্ঞাসা করলেন ব্রহ্মচারী—"ধর্মে মতি হয় তীর্থ-দর্শন করলে—এই যদি বলতে চান আপনি, তা হলে আগে বলুন যে ধর্মটা কি ?"

ঘোষাল মশাই বললেন—"যে সমস্ত নিয়ম মেনে চললে মানুষ প্রকৃত সুখ-ভোগ করে, শান্তি পায়, তা-ই হচ্ছে ধর্ম। 'যতোহভ্যুদয়নিঃ- শ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্ম'।"

হাল ছেড়ে দেবার সুরে ব্রহ্মচারী বললেন—"ঢুকল না কিছুই মাথায়।"

ঘোষাল মশাই হো হো শব্দে হেসে উঠলেন। বললেন—"সেটা ধর্মের দোষ নয়, মাথার দোষ। না খেয়ে না ঘুমিয়ে অবিরাম ঘুরে মরছ, এতে আর কাঁহাতক্ মাথার ঠিক থাকে! ধর্ম-অধর্ম এ সমস্ত বোঝা মনের কাজ। সেই মন খোরাক না পেয়ে পেয়ে মুমূর্ষু অবস্থায় পৌঁচেছে, এখন বুঝবে কে ? মনকে মেরে ফেললে বোঝা না বোঝার দায় থেকেও নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। তোমরা মনকে হত্যা করার সাধনা করছ। এর পর একটা গাছ বা পাথর বনে গিয়ে সুখে থাকতে পারবে। ব্যাস—হাঙ্গামা চুকে গেল, ধর্ম-অধর্মের বালাই একেবারে ঘুচে যাবে।"

একটু যেন চড়ে উঠল ব্রহ্মচারীর মেজাজ। ঝাঁজিয়ে উঠলেন তিনি—"তার মানে যারা গাণ্ডে-পিণ্ডে গিলে হাঁসফাঁস করে মরছে, তারা ছাড়া আর কারও কিছু বোঝার সামর্থ্য নেই ?"

ঘোষাল মশায়ের গলায় কৌতুকের রেশ। যেন একটা বেশ মজার আলোচনা চলছে। হালকা ভাবে বলতে লাগলেন—"হাঁসফাঁস করে যারা মরে তারা যেমন কিছু বুঝতে পারে না, তেমনি না খেয়ে শুকিয়ে মরছে যারা তাদেরও কিছু বোঝার সামর্থ্য থাকে না। যা খাচ্ছি তার যে সূক্ষ্মতম অংশ, সেইটুকুই ওপর দিকে উঠে মনে হয়, মানে তাই দিয়েই মনের জোর বাড়ে। উপনিষদে আছে—'এবমেব খলু সোম্যান্নস্যাশ্যমানস্য যোঽণিমা, স ঊর্ধ্বঃ সমুদীষতি, তন্মনো ভবতি।' দিন পনেরো শুধু জল খেয়ে থাকলেই বোঝা যাবে যে মাথায় আর কিছু ঢুকছে না। মনকে সতেজ রাখতে হলে নিয়ম মত খাওয়াদাওয়া করা দরকার। এ সমস্ত অতি সোজা কথা ব্রহ্মচারী, কিন্তু তোমরা এসব বুঝবে না, কারণ তোমরা মনকে সাবাড় করার সাধনা করছ।"

বেশ ভাবনায় পড়ে গেলেন ব্রহ্মচারীজী। বললেন—"কিন্তু মনের হ্যাংলা-পনাকে দুরন্ত না করলে বিপদ ঘটবে যে। মন যা চায় তা কি সব সময় মনকে দেওয়া উচিত।"

ঘোষাল মশাই সজোরে ঘোষণা করলেন—"সুস্থ সবল মন হ্যাংলাপনা করবে কেন? যেখানে দেখা যায় যে মন বিকারগ্রস্ত—সেখানে বিকারের চিকিৎসা করাই দরকার। কিন্তু রুগীটার চিকিৎসা করা আর রুগীটাকে খেতে না দিয়ে আস্তে আস্তে নিস্তেজ করে মেরে ফেলা তো এক কথা নয়। রোগ-রুগী দুই গেল, কাঁথাখানা পড়ে কোঁকাতে লাগল, এ বড় মোক্ষম চিকিৎসা বটে। আচ্ছা সে কথা থাক্, আগে আমায় বোঝাও যে মন বলতে তুমি বোঝ কি? আমি যদি বলি, মানুষের মনটিই সব থেকে বড় তীর্থ, যে তীর্থে দেবতার দেবত্ব যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে পান্ডা-পুরুত, চোর-গুন্ডা-বেশ্যার ছ্যাচড়ামি, আমি যদি বলি সেই মন-তীর্থের সংস্কার করাই হল সব থেকে বড় কিছু করা, তা করতে পারলে দেবত্বের মহিমায় সে তীর্থে প্রকৃত শান্তি মেলা সম্ভব, তা হলে বোধ হয় মিথ্যে বলা হবে না। তীর্থে গেলে এই কাজটি হয়। অর্থাৎ মনের সংস্কার হয়। কতকাল আগে, এক-এক জন মানুষ এইসব স্থানে বসে মনকে সংস্কার করার সাধনা করেছিলেন, চৈতন্য-লাভ করেছিলেন, সেই চৈতন্য আজও রয়ে গেছে ভারতের তীর্থে তীর্থে। সেই চৈতন্যের স্পর্শ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা মনে নিয়ে যারা তীর্থে যায়, তারা তা পায়। মনটাকে ছুঁইয়ে নিয়ে আসতে পারে সেই অবিনশ্বর শক্তির সঙ্গে। তাতে ফল হয় এই, মন বলে যে যন্ত্রটা নিয়ে সংসার করে মানুষে, সেটা সংসারের নোংরামির সঙ্গে যুঝতে পারে, সংসারেও শান্তি খুঁজে পায়। আর যারা মনকে সেরকম তৈরী করে নিয়ে তীর্থে যায় না, তারা তীর্থে গিয়ে হয় ব্যবসা ফেঁদে বসে বা তীর্থকাক দের খেয়োখেয়ি দেখে আরও ভড়কে যায়।"

বাধা পড়ল ঘোষাল মশায়ের বাক্যস্রোতে। অসহিষ্ণু কণ্ঠে ব্রহ্মচারী বলে উঠলেন—"আঃ, কি আপদ রে বাবা! সেই চৈতন্য-শক্তিটাই যে কি জিনিস সেটার ধারণা না থাকলে তার স্পর্শ পাওয়ার জন্যে মনকে তৈরী করব কি করে? চৈতন্য-ফৈতন্য ওই সব গালভরা কথা শুনতে শুনতে—"

বাধা পড়ল ব্রহ্মচারীর গলাবাজিতেও, ওধারে কে হুঙ্কার দিয়ে উঠল—"তবে রে স্কাউন্ড্রেল শুয়োরের বাচ্চা পাজী—" সঙ্গে সঙ্গে ধুপাধপ্ মারের আওয়াজ।

লাফিয়ে উঠলাম সকলে। ঘোষাল মশাই আর্তনাদ করে উঠলেন—"বিনু, বিনু গেল কোথা?" সে কথায় কান দেবার ফুরসত কই—ছুটলাম। ইঞ্জিন-ঘরের ওপাশে ঘটছে ব্যাপারটা। যাত্রীদের মোটঘাট টপকে ওধারে পৌঁছে চোখে পড়ল রেলিঙের ধারে ছোটখাটো একটা ভিড়। ভিড়ের ওধার থেকে একখানা হাতখানেক লম্বা লোহার শাবল উঁচু হয়ে উঠল সকলের মাথার ওপর, কিন্তু সেখানা আর নামবার অবকাশ পেল না। সেই মুহূর্তে সজোরে আর একটা জিনিস নামল সেই হাতের ওপর। জিনিসটাকে চিনতে পারলাম, ব্রহ্মচারীর

বগলের ঠেঙা। ঠেঙাখানা বার চার-পাঁচ উঠল আর নামল চক্ষের নিমেষে। আমাকে ধাক্কা দিয়ে দুড়দাড় শব্দে ছুটে চলে গেল সকলে। কোনও রকমে সামলে দুই লাফে গিয়ে পেঁাছলাম ওদের কাছে। নাতনীটি নাতজামাইকে জড়িয়ে ধরে ঠক্‌ঠক করে কাঁপছে। নাতজামাইটির জামা গেছে ছিঁড়ে, ঠোটের কোণ দিয়ে রক্ত ঝরছে। আর বাঁ বগলে ঠেঙা গুঁজে রেলিং ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ব্রহ্মচারী। তখনও বাগিয়ে ধরে আছেন ডান বগলের ঠেঙাখানা দু হাতে।

ওধার থেকে ঘোষাল মশাইও এসে পেঁাছলেন। সারেং-খালাসীরা ঘিরে ধরল আমাদের সকলকে। ব্যাপারটা তখন বোঝা গেল।

মন তীর্থ ধর্ম-অধর্ম ইত্যাদি সব নীরস আলোচনায় মেতে উঠেছিলেন যখন ঘোষাল মশাই, তখন ফাঁক পেয়ে তাঁর নাতনী আর নাতজামাইটি উঠে চলে আসে এধারে। এধারটায় কারও নজরে পড়বে না এই ভেবে দু জনে বোধ হয় একটু বেসামাল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু যাদের নজর রাখবার কথা, তারা ঠিকই নজর রাখছিল। দু জন মগ ছোকরাও এসে উপস্থিত হয় ওদের কাছে। তারা কি বলেছিল বা কি করেছিল তা আর বলবে কে, কিন্তু এমন কিছু ঘটে যে নাতজামাইকে হাত চালাতে হয়। তখন তেড়ে আসে ওদের সজাতি সকলে। যদি আর একটি মুহূর্তও দেরি হত ব্রহ্মচারীর পেঁাছতে, তা হলে সেই লোহার শাবল নামত নাতজামাই সাহেবের মাথার খুলির ওপরে। তার পর কি হত কে আন্দাজ করবে!

বিশুদ্ধ চট্টগ্রামী ভাষায় বেশ দু কথা শুনিয়ে দিলেন বুড়ো সারেং সাহেব ওরকম সাজ-পোশাক পরা, অতটা বেসামাল হওয়া যে বিবিসাহেবের উচিত হয় নি, একথা বলতে তাঁর মুখে বাধল না। খালাসীদের মধ্যে দু-এক জন এমন কথাও বলতে ছাড়লে না যে হিন্দুদের ঘরে ইজ্জত নেই, ওদের নিজেদের বিবিদের পর্দা আছে। বে-পর্দা বে-আবরু চালচলনের দরুনই হিন্দু জাতটা জাহান্নমে যাবে।

সে যখন যাবে তখন যাবে, আপাততঃ আমাদের ওরা আদিনাথে না নামতে পরামর্শ দিলেন। কারণ সেই ছোঁড়া দুটো আর তার সাঙ্গপাঙ্গরা আদিনাথেই নামবে!

নাতজামাই গর্জে উঠলেন—"হুঃ, ওদের ভয়ে নামব না আদিনাথে। যত সব ইয়ে! মগের মুল্লুক পেয়েছে কিনা, নামবই আমরা। আমার কাছে বন্দুক আছে।"

ঘোষাল মশাই রাজী হলেন না। জানেন কিনা তিনি যে, বন্দুক থাকলেও মানুষের ওপর তা চালাবার হুকুম নেই। বিশেষতঃ যখন শোনা গেল, মগের মুল্লুকে ওরকম উঁচু জাতের না হলেও সাধারণ বন্দুক দশ-বিশ গণ্ডা আছে,

তখন বন্দুকের গরম ঠান্ডা হয়ে এল। তার ওপর কি জানি কেন, নাত্‌নীটি সেই যে দাদুর কোলে মাথা গুঁজে ফুলে ফুলে কান্না শুরু করলেন, সে কান্না আর কিছুতে থামতে চাইল না। অতএব ও'রা নামায় ক্ষান্ত দিলেন।

ব্রহ্মচারী সনাতন শর্মা কিন্তু গুছিয়ে নিলেন তার কম্বলখানি। ডান কাঁধের ওপর দিয়ে সেখানি সামনে পেছনে ঝুলিয়ে দিলেন। তার পর কোমরের সঙ্গে আচ্ছা করে কষে বাঁধলেন একখানি গামছা দিয়ে। পুঁথিপত্রের ছোট্ট পুঁটলিটি বাঁ কাঁধে ঝুলিয়ে লোটা হাতে তৈরী হলেন নামবার জন্যে। দেখে আমাকেও গোছাতে হল।

তখন আমাদের পানে নজর পড়ল ঘোষাল মশায়ের। আঁতকে উঠে ব্রহ্মচারীর হাত দুখানা জড়িয়ে ধরলেন। "কি সর্বনাশ—আপনি নামবেন কি! আপনিই ওদের ঠেঙিয়েছেন, আপনাকে পেলে ওরা আস্ত রাখবে নাকি?"

সারেং-খালাসীরাও এগিয়ে এল। ওদেরও তাই মত, ব্রহ্মচারীজীর কিছুতে নামা চলতে পারে না।

ব্রহ্মচারীজীও কিছুতে কারও মানা শুনবেন না।

আদিনাথ দ্বীপ ভেসে উঠল চোখের সামনে। স্টীমারের বেগ কমে এল। ঢং ঢং টিং টিং নানারকম শব্দ উঠল ইঞ্জিনঘরে। তখনও চলছে ব্রহ্মচারীকে সাধাসাধি।

হঠাৎ দেখা গেল নাত্‌নী বিনু উঠে দাঁড়িয়েছে। দাঁড়িয়ে নিজের জামা-কাপড় টেনেটুনে গোছগাছ করছে। ব্রহ্মচারীর দিকে ফিরে বললে—"চলুন, আপনি যদি নামেন, তা হলে আমিও নামব আপনার সঙ্গে।"

শুনে সকলে একেবারে থ।

কয়েক মুহূর্ত ব্রহ্মচারী হাঁ করে চেয়ে রইলেন মেয়েটার দিকে। তার পর কোমরের গামছাটা টান দিয়ে খুলে কাঁধের পোঁটলাটা আছড়ে ফেললেন ডেকের ওপর। ফেলে সেই পোঁটলায় মাথা দিয়ে টান হয়ে শুয়ে পড়লেন।

সকলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম।

জাহাজ থামল। যাত্রীরা নেমে গেল উঠলও বোধ হয় দু-এক জন। আবার জাহাজ ছাড়ল।

করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম আদিনাথ দ্বীপের দিকে। কারও মুখে রা নেই। দিনের অর্ধেক তখন পার হয়েছে।

জাহাজ চলল কক্সবাজার না কোথায়। তার পর যাবে টেকনাফ্। তার পর এই পথেই ফিরে যাবে চট্টগ্রামে।

হায় কপাল, তীর্থ দর্শন কোথায় গিয়ে গড়াবে তাই বা কে জানে!

॥ তিন ॥

শ্রীভগবান স্বয়ং শ্রী মুখে উপদেশ দান করেছিলেন—

ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ।

সুতরাং অতি অল্পক্ষণই লাগল ব্রহ্মচারীজীর সামলাতে। একটু পরেই তিনি বুঝতে পারলেন যে অতটুকু একটা মেয়ের আদুরেপনার কাছে তাঁকে হার মানতে হয়েছে। ঠোঁটে গালে রঙ্ মাখা বেচালের বেহদ্দ বড়লোকের এক আহ্লাদী নাতনীর চালে তাঁর প্রচন্ড ব্রহ্মচর্য ব্রতের প্রদৃপ্ত তেজ মিইয়ে ঠান্ডা হয়ে গেছে। তিনি সঙ্কল্পভ্রষ্ট হয়েছেন। সব থেকে জঘন্য ব্যাপার, তখনও তিনি সেই পাপ নাতনী-নাতজামাইদের সঙ্গ বরদাস্ত করতে বাধ্য হচ্ছেন।

এত বড় হৃদয়দৌর্বল্যটাকে ক্ষমা করার ক্ষমতা আর যারই থাকুক, ব্রহ্মচারীজীর থাকতেই পারে না। আর একটি কথাও তিনি কইলেন না, নিজের পোঁটলাটি আর এক বার কাঁধে তুললেন। তার পর ঠেঙা ঠকঠক করে চলে গেলেন স্টীমারের শেষ দিকে। তখনই স্টীমার ত্যাগ করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন না, এই যা রক্ষে।

অগত্যা আমাকেও উঠতে হল। আমি তল্পিদার, তল্পিদার মানুষের মর্জি থাকতে নেই। ব্রহ্মচারীজী উঠে যাবার পর ও'দের কাছ বসে থাকাটাও কেমন যেন খারাপ দেখাতে লাগল, নেহাত হ্যাংলাপনা বলে মনে হতে লাগল নিজের কাছেই। ও'রা তিন জন আমাদের চলে যাওয়াটা ইচ্ছে করেই দেখলেন না। কেই বা দেখে ! নাতনী বিনু আপাদমস্তক চাদড়-মুড়ি দিয়ে সেই যে শুয়েছে আর নড়ছে চড়ছে না। ঘোষাল মশাই পেছন ফিরে বসে চোখ বুজে ঠোঁট নাড়ছেন সমানে। নাতজামাইটি কোথায় লুকিয়ে পড়েছেন তার পাত্তা নেই। কাজেই বিদেয় নেওয়া ইত্যাদি সদাচারগুলো ঘটে উঠল না। উঠে গিয়ে ব্রহ্মচারীজীর পাশে বসে পড়লাম। তিনিও একটি কথা কইলেন না, তাঁর হাতে তখন মালা ঘুরছে।

চুপ করে বসে থাকতে থাকতে স্টীমারের দুলুনিতে বোধ হয় একটু ঢুলুনি এসে গিয়েছিল। কাঁধের ওপর চাপ পড়তে চমকে উঠলাম। মুখ ঘুরিয়ে দেখি নাতজামাইটি দাঁড়িয়ে আছেন। চোখের চাউনিতে সকরুণ মিনতি, ইশারা করলেন উঠে যাবার জন্যে।

হল কি আবার! আবার কোনও ফ্যাসাদ বাঁধল নাকি!

নিঃশব্দে উঠে গেলাম। জলের ট্যাঙ্কের ওধারে পৌঁছে জিজ্ঞাসা করলাম —"কিছু বলবেন ?"

ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি। অদ্ভুত অবস্থা তখন তাঁর চোখমুখের। ঠোঁট নড়ল কিন্তু কথা একটিও বেরুল না।

আরও কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বললাম—"বলুন না কি বলছেন।"

জিব দিয়ে ঠোঁট চেটে ঢোঁক গিলে ফিসফিস করে বললেন তিনি—"হ্যাঁ—এই—মানে—আপনারা কক্সবাজারে নামছেন তো। আপনার কাছে একখানা চিঠি দিচ্ছি। কক্সবাজারে ইনি থাকেন, আমার এই চিঠিখানা এ'কে দিলে ইনি আপনাদের সমস্ত ব্যবস্থা করে দেবেন।"

চিঠিখানা নিলাম তাঁর হাত থেকে। নিয়ে বললাম—"বোধ হয় দরকার হবে না এ চিঠির, ব্রহ্মচারীজী এসব পছন্দ করবেন না হয়তো।"

"তা জানি, ও'কে তো কিছু বলা যায় না। দয়া করে আপনি রাখুন চিঠিখানা, যদি দরকারে লাগে।"

এমন ভাবে তিনি তাকিয়ে রইলেন আমার চোখের ওপর, এমন একটা অস্বাভাবিক সুর বেরল তাঁর গলা দিয়ে, এমন অসহায় ভাবে কাঁপতে লাগল তাঁর চিঠিসুদ্ধ হাতখানা যে না ধরে থাকতে পারলাম না। হাতখানা টিপে ধরে বললাম—"ভয়ানক নরম আপনার মন। ছিঃ, এই সামান্য ব্যাপারে এত উতলা হচ্ছেন কেন?"

ভদ্রলোকের মুখ নুয়ে পড়ল। আস্তে আস্তে হাতখানি ছাড়িয়ে নিয়ে ঘাড় হে'ট করে চলে গেলেন।

চিঠিখানি লুকিয়ে নিয়ে ফিরে গেলাম ব্রহ্মচারীজীর পাশে। সমানে তাঁর হাতের মালা ঘুরে চলেছে। জানতাম যে ও মালা ঐভাবে ঘুরতেই থাকবে যতক্ষণ না উনি স্টীমার ছেড়ে ডাঙায় পা দিচ্ছেন। জপ হল সব থেকে দুর্ভেদ্য খোলস ব্রহ্মচারীজীর। যাঁর মন্ত্র উনি জপছেন তিনি স্বয়ং আবির্ভূত হলেও ঐ খোলস ভেদ করে ও'কে ধরতে ছু'তে পারবেন না।

শুয়ে পড়লাম চাদর মুড়ি দিয়ে। শুনতে লাগলাম সমুদ্রের বুকের ভেতরের তুমুল তোলপাড় ধ্বনি। শুনতে শুনতে হঠাৎ মনে হল সমুদ্রও যেন জপ করছে, আদি-অন্ত-হীন অবিরাম জপ। জগৎজোড়া আত্মপ্রতারণা আর আত্ম-গ্লানির দুর্ভর বোঝাটাকে ডাঙার ওপর ঠেকিয়ে রাখবার আশায় নিরন্তর আত্মরক্ষা-মন্ত্র জপে চলেছে সমুদ্র। এ জপ থামবে সেদিন, যেদিন বিশ্ব-ব্রহ্মান্ডটা একেবারে নিঃসাড় নিঃসংজ্ঞ হয়ে ঘুমিয়ে পড়বে।

বিশ্বব্রহ্মান্ডটা কবে ঘুমিয়ে পড়বে তাই ভাবতে ভাবতে আর সামুদ্রিক জপের মন্ত্র শুনতে শুনতে বোধ হয় একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ পিঠের ওপর এক খোঁচা লাগল। কানে গেল—"কি হে, নামবে নাকি এখানে?"

ধড়মড়িয়ে উঠে বসে জিজ্ঞাসা করলাম—"কোথায়! কোথায় নামব আমরা?"

ডাঙার দিকে চেয়ে ব্রহ্মচারী বললেন—"কক্সবাজার। চল নামি, স্টীমারের সারেংকে বলেছি, ওরা আমাদের এখানে নামিয়ে দিতে রাজী হয়েছে।"

অতএব উঠতে হল।

অনেক কান্ডকারখানা কসরতের পর ডাঙায় যখন পড়ল আমাদের ঠ্যাং

তিনখানা, তখন ফুরসত মিলল পেছন ফিরে তাকাবার। সেই হৃদয়দৌর্বল্যং, অকারণ মনটা খুব ভারী হয়ে উঠল। না, কোথাও তাঁদের চিহ্নমাত্র দেখা গেল না, স্টীমারখানার আগাপাস্তলা বারবার নজর বুলিয়ে নিলাম। বৃথা আশা, দাদু নাতনী নাতজামাই—নিজেদের লুকিয়ে ফেলেছেন ওঁরা। স্টীমার না ছাড়া পর্যন্ত মুখ দেখাবেন না।

কক্সবাজার।

কক্সবাজারের অয়স্কান্ত বকশীর নামে চিঠি রয়েছে আমার কাছে। চিঠি নিয়ে তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালেই তিনি সমস্ত ব্যবস্থা করে দেবেন। ব্যবস্থাটা কি করবেন, তাই ভাবতে লাগলাম। কক্সবাজার যখন বাজার তখন অয়স্কান্ত ছাড়া অন্য মানুষও আছে। মানুষ যেখানে আছে, সেখানে ভিক্ষে পাওয়া যাবেই। দিনান্তে একবার পেটের মধ্যে কিছু চালান দেওয়া, আর হাটে মাঠে যেখানে হোক পড়ে থাকা, এজন্যে কারও কোনও ব্যবস্থা করার প্রয়োজনই করে না। প্রয়োজন যেখানে নেই, সেখানে কে যায় অয়স্কান্তের কাছে। থাকুন অয়স্কান্ত শান্তিতে, ব্রহ্মচারীজী এক কালীবাড়ির সন্ধান করতে লাগলেন। কোথায় নাকি উনি শুনেছিলেন, কক্সবাজারেও কালীবাড়ি আছে। থাকাই উচিত, বাজার থাকলেই কালী থাকবেন। যেখানে যত বাজার দেখেছি, কালী আছেনই। কালী না থাকুন, কালীতলা আছে। বছরে অন্ততঃ একবার ধুমধাম করে পুজো হয়। কালী-বিহীন বাজার চলে কখনও!

কক্সবাজারের কালীবাড়ি খুঁজে বার করতে হল না। ঘাট থেকে উঠে জিজ্ঞাসা করতেই সকলে সোজা পথ দেখিয়ে দিলে। কালীবাড়ির সামনে একটা ভাঙা আটচালার কোণায় আমরা কম্বল পাতলাম। ব্যাস, সাত দিনের জন্যে কোনও ভাবনা চিন্তা রইল না। কক্সবাজারের কালীবাড়িতে সাধু-সন্ন্যাসীর জন্যে প্রথম সাত দিন সদাব্রত দেবার ব্যবস্থা আছে। চাল ডাল তেল নুন আনাজপাতি দিয়ে সাজানো একটি করে সিধে সকাল হলেই সামনে রেখে যায়। কোথাও ছুটোছুটি করার দরকার করে না।

সাত দিনের প্রথম দুটো দিন নির্বিঘ্নে কেটে গেল। তার পর ঘুরতে শুরু করলাম। ঘুরতে ঘুরতে কক্সবাজার ফুরিয়ে গেল। এক জায়গায় বসে নিশ্চিন্তে মালা ঘোরাবার সামর্থ্য নেই ব্রহ্মচারীর মত, মালার মধ্যে কি মজা লুকনো আছে তাও জানি না। কক্সবাজারের সামনে সমুদ্র পেছনে বন। শুধু বন নয়, বন পাহাড় সাপ বাঘ হাতী এবং আরাকানী মগ। ওধারে এগোবার সাহস হল না, সমুদ্রটাই যে ভাবে হোক পার হতে হবে। স্টীমার ঠিক যাচ্ছে আসছে, গুটি কয়েক টাকা হলেই স্টীমারে চেপে ফিরে যাওয়া যায়। টাকা কটি যোগাড় করা যায় কেমন করে!

পরামর্শ করতে গেলাম ব্রহ্মচারীর সঙ্গে। উনি সাফ জবাব দিলেন—"বেশ তো আছি। ধৈর্য ধরে বসে থাকলে টিকিটের টাকা এক দিন নিজে এসে পৌঁছবে।"

পৌঁছক যবে পৌঁছয়। ব্রহ্মচারীকে লুকিয়ে অয়স্কান্ত সম্বন্ধে খোঁজখবর নিতে শুরু করলাম।

কক্সবাজারের অয়স্কান্ত বকশীকে কক্সবাজার সুদ্ধ মানুষে ভয়ানক ভাবে চেনে। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সংবাদ রাখে সকলে অয়স্কান্ত কখন কি করেন, কখন তাঁর মেজাজ কেমন থাকে। অয়স্কান্তের আকর্ষণী শক্তি এত বেশী যে কক্সবাজারের যাবতীয় মুনাফা, সব দৌড়তে দৌড়তে গিয়ে তাঁর অঙ্গের সঙ্গে আটকে যায়। হেন জিনিস নেই যার কারবার করেন না অয়স্কান্ত। মাছ কাঠ ধান তেল লোহা লক্কড় টিন ওষুধ কাপড় জামা সাইকেল জুতো সোনাদানা হীরে জহরত, দুনিয়ার যাবতীয় জিনিস বক্সী কোম্পানির জাহাজ কক্সবাজারের জন্যে বয়ে নিয়ে আসে। বড় বড় অফিস, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গুদাম, শত শত মানুষ জন, মায় এক সাহেব ম্যানেজার পর্যন্ত আছে বকশী মশায়ের। বকশী মশায় বড় সহজ মানুষ নন।

সহজ মানুষ নন বলেই অষ্টপ্রহর তিনি জেগে থাকেন আর লোকজনকে গালমন্দ করেন। কক্সবাজারের প্রত্যেকটি প্রাণী তাঁর নামে কাঁপে, সকলেই মুখ বুজে তাঁর বেহিসেবী তম্বি সহ্য করে। সহ্য করে কি সাধে! অয়স্কান্তের কাছ থেকে বেহিসেবী পায়ও সকলে। অর্থাৎ অয়স্কান্তের আকর্ষণ বিকর্ষণ দুই-ই সমান। দুনিয়ার কোনও বস্তু ওঁর নিজের নয়। একটা জিনিসের ওপর তাঁর মায়া নেই। ভালবাসেন শুধু সোডার গুঁড়ো ভরতি শিশিগুলোকে। অয়স্কান্ত বকশী ফতুয়া পরে থাকেন, ফতুয়ার দু পকেটে দুটি সোডাভরতি শিশি আছেই। শুধু পকেট কেন, অয়স্কান্তের টেবিলের ওপর, মাথার বালিশের নীচে, পুজোর ঘরে আসনের পাশে, এমন কি স্নানের ঘরের তাকে পর্যন্ত ঐ সাদা গুঁড়ো বোঝাই শিশি সাজানো আছে। শিশিতে শিশিতে অয়স্কান্তের বাড়ি ছয়লাপ, দিন-রাতের যে কোনও সময় হাত বাড়ালেই সোডা পাওয়া চাই। নয় তো যা ঘটে তার নাম তছনছ হয়ে যাওয়া। শিশি না পেলে হাতে যা ঠেকবে, চোখ বুজে তাই ছুঁড়তে থাকেন অয়স্কান্ত। এমন কি নিরেট সোনা দিয়ে তৈরী তাঁর ইষ্টদেবতা রাম-সীতাও ছোঁড়ার হাত থেকে রেহাই পান না।

প্রমাদ গুণলাম। সেই সদা-বিক্ষুব্ধ বিক্ষেপপ্রবণ অয়স্কান্তের সামনে উপস্থিত হতে সাহসে কুলোল না। ঘোষাল মশায়ের নাতজামাই প্রদত্ত চিঠিখানি সঙ্গে রয়েছে, সেখানি বার করে বারবার উলটে-পালটে দেখলাম। খামের ওপর লেখা: অয়স্কান্ত বকশী—কক্সবাজার, খামের ভেতর কি আছে কে

জানে। কয়েক বার ভাবলাম, খামখানা খুলে চিঠিখানি পড়ে দেখি। কিন্তু ছেঁড়া খাম অয়স্কান্তের হাতে কি দেওয়া যাবে! খামের মুখ খোলা দেখলেই যদি তাঁর নিজের মুখ খুলে যায়!

ভাবতে ভাবতে ঘুরতে ঘুরতে আর নিষেধ শুনতে শুনতে কেমন যেন একটা জিদ চেপে গেল। অমন অসাধারণ মানুষটিকে একটিবার না দেখে কক্স-বাজার থেকে চলে যাব! বাঃ, তা হলে অত কষ্ট করে কক্সবাজারে এসে জুটলাম কেন!

আদিনাথ দর্শন ভাগ্যে ঘটল না। সেটা না হয় ঐ ভাগ্যের ঘাড়ে চাপিয়ে মনকে বুঝ দিলাম। কিন্তু অয়স্কান্ত না দেখে যাওয়াটাকে তো আর ভাগ্যের ঘাড়ে চাপানো চলবে না। ও'র নামে চিঠি রয়েছে, সুতরাং সামনে গিয়ে দাঁড়াবার দস্তুরমত একটি উপযুক্ত ছুতোও রয়েছে। হলেনই বা অয়স্কান্ত ভয়ানক জীব, তা বলে খপ্ করে তো আর খেয়ে ফেলতে পারবেন না।

অবশেষে পেঁাছলাম গিয়ে বকশী-বাড়ির ফটকের সামনে।

গেট বন্ধ, গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে এমন এক দৃশ্য দেখতে পেলাম যে এগিয়ে গিয়ে ডাকতে পর্যন্ত সাহস হল না। দেখলাম, খেংরা কাটির মত রোগা অস্বাভাবিক লম্বা এক জন বয়স্থ লোক এক পাল ভীষণদর্শন কুকুরের মাঝ-খানে দাঁড়িয়ে একখণ্ড কাঁচা মাংস নিয়ে লোফালুফি করছে। মাংসখণ্ডটা আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে সব কটা কুকুর লাফিয়ে উঠছে সেটা ধরবার জন্যে। কিন্তু ধরতে পারছে না কেউ, আশ্চর্য কায়দায় কুকুরদের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়ে লোকটাই আগে লুফে নিচ্ছে সেটা। তখন কুকুরে মানুষে লাগছে কাড়াকাড়ি। চিৎকারে হুংকারে ফেটে যাচ্ছে আকাশ। দূরে দাঁড়িয়ে সেই রোমহর্ষণ কাণ্ড দেখতে লাগলাম।

অনেকক্ষণ ধরে চলল সেই ভয়ঙ্কর খেলা। তার পর মস্ত একটা বালতি নিয়ে আর এক জন লোক বেরিয়ে এল ভেতর থেকে। বালতি দেখে কুকুর-গুলো হন্যে হয়ে উঠল। তখন লাগল কুকুরদের সঙ্গে সেই লম্বা লোকটির লড়াই। লোকটি থাবড়ে ঘুষিয়ে কুকুরগুলোকে ঠাণ্ডা ক'র দাঁড় করালে তফাতে তফাতে। পরিবেশন করা শুরু হল মাংস-ভাত। কারও নড়বার জো নেই, কেউ কারও খাবারের দি'কে মুখ বাড়ালেই এক চড়। সে কি চড়ের বহর! চড় পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই ভয়ঙ্কর জীবটি কেঁচো হয়ে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে নিজের জায়গায়, যেন কিচ্ছু জানে না।

শেষ পর্যন্ত খাওয়া-দাওয়া চুকল। কুকুরগুলোকে নিয়ে লোকটি বাড়ির ভেতর চলে গেল। যে লোকটি বালতি নিয়ে এসেছিল সে তখন পরিষ্কার করতে লাগল জায়গাটা। এগিয়ে গিয়ে তাকে বললাম, অয়স্কান্তবাবুর সঙ্গে দেখা

করতে চাই।

দু হাত আমার মুখের সামনে নেড়ে প্রচুর পরিমাণ ঙ এঃ খরচা করে ঝড়ের বেগে যা বললে লোকটা তা থেকে এইটুকুই বুঝলাম যে কিছুতেই দেখা করাটা ঘটে উঠবে না। অবিলম্বে বিদেয় হও।

তখন সেই চিঠিখানি বার করে অনুনয় করে বললাম—"এই চিঠিখানি দিয়ে এস তোমার বাবুকে।"

কাজ হল, আধ মিনিট সময় আমার মুখের পানে তাকিয়ে থেকে ছোঁ মেরে চিঠিখানা নিয়ে ভেতরে চলে গেল লোকটি। মিনিট দুয়েকও লাগল না, বেরিয়ে এল সেই খেংরা কাঠির মত রোগা মানুষটি। চড়া গলায় জিজ্ঞাসা করলে— "আপনি এনেছেন এই চিঠি?"

বললাম—"হ্যাঁ, অয়স্কান্তবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

"অয়স্কান্ত বাবু! কোন্ শালা অয়স্কান্ত বাবু? বকশী, অয়স্কান্ত বাবু নয়, শুধু বকশী। বুঝলেন মশাই, বলবেন হারামজাদা অয়স্কান্ত বকশী— ব্যাস। বাবু এই কক্সবাজারে বিস্তর আছে, কিন্তু বকশী শুধু এই অয়স্কান্ত —বুঝলেন! আর একটি বকশী খুঁজে পাবেন না এই কক্সবাজারে।" বলে নিজের হাড় উঁচু করা বুকের ওপর মারলেন এক থাপ্পড়।

হাঁ করে চেয়ে রইলাম। ইনিই অয়স্কান্ত! এই মাংসশূন্য হাড় ক'খানাকে লোকে অত ভয় করে! সসম্ভ্রমে বললাম—"আপনার কাছেই এলাম।"

"এসে আমায় কেতাত্থ করেছেন। এখন চলুন, ভেতরে চলুন, শুনি, আপনার জন্যে কি করতে হবে। যে শালা এই চিঠি দিয়েছে তাকে পেলেন কোথায় বলুন। গেরুয়াধারীদের সঙ্গে আজকাল মিশছে না কি সে শালা? তবেই তো মাথা খেয়েছে দেখছি। চলুন, ভেতরে চলুন।"

গেট পার হলাম।

স্বয়ং অয়স্কান্ত বকশী মশায়ের সঙ্গে ঢুকলাম বকশী-বাড়ির ভেতরে। বকশীর মশায়ের বসবার ঘর, সভ্য ভাষায় যাকে বলা হয় ড্রইংরুম। কাঠের মেঝে, কাঠের দেওয়াল, কাঠের চাল। চালের তলার দিকে কাঠ, ওপরে টিন। আসবাব পত্র কিন্তু কাঠের নয়, সমস্ত দাঁত হাড় শিং চামড়া দিয়ে বানানো। বাঘের চামড়া দিয়ে সমস্ত মেঝেটা মোড়া। তার ওপর টেবিল চেয়ার যা সব বসানো রয়েছে সেগুলোর পায়া হাতি মোষ হরিণ ইত্যাদি প্রাণীর দাঁত শিং দিয়ে তৈরী। ঐ সমস্ত জিনিস ছাওয়াও হয়েছে চামড়া দিয়ে। কাঠের দেওয়া-লের গায়ে ঝুলছে সাপের চামড়া, কুমীরের চামড়া, আরও কত সব প্রাণীর বহির্বাস। তার মাঝে মাঝে লটকানো রয়েছে ছোরা ছুরি বর্শা বল্লম ভোজালি খাঁড়া—আরও কত কি মারাত্মক জাতের অস্ত্র যা চোখেও দেখি নি কখনও। এক

কোণে গাদা হয়ে পড়ে আছে গোটাকতক রাইফেল বন্দুক পিস্তল। অনেকগুলো চামড়ার খাপ বেল্ট ডাঁই হয়ে আছে সেখানে। পেছন দিকের বারান্দায় ঠ্যাঙে দড়ি বেঁধে হেঁট মুণ্ডে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে সদ্য খুন করা একটা চিতাকে। বোধ হয় সেটার ছাল ছাড়াবার ফুরসত তখনও হয় নি।

ঘরে পা দিয়েই বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল। কয়েক মুহূর্ত লাগল দৃশ্যটা সইয়ে নিতে। একটা চাপা বিদকুটে গন্ধে দম আটকে এল। হঠাৎ বিকট চিৎকার করে উঠল কারা, চমকে উঠে এধার ওধার তাকাতে লাগলম। অয়স্কান্ত ডাক দিলেন—"আয় বালি, আয় তারা।"

মিশমিশে কালো দুটো প্রাণী কোথা থেকে লাফিয়ে নামল বকশী মশায়ের সামনে। পরমুহূর্তেই তাঁর গা বেয়ে উঠে গিয়ে বসল তারা দুই কাঁধের ওপর। বসে আমার দিকে চেয়ে প্রাণপণে চেঁচাতে লাগল। তখন দেখলাম তাদের শ্রীমুখ দুখানি। সারা অঙ্গ মুখ মাথা সব কালো, শুধু চোখের চতুর্দিক সাদা। ঐ সাদা রঙওয়ালা চোখ থাকার দরুনই বোধ হয় অমন সাংঘাতিক দেখায় ওদের মুখ। জানোয়ার দুটো সমানে চেঁচাতে লাগল আর দাঁত খিঁচোতে লাগল আমায়। অর্থাৎ ওরা আমায় ওদের সজাতি বলে মেনে নিতে পারছে না।

আবার সেই চড়, দুই চড় পড়ল দুজনের পিঠে। খেঁক খেঁক করে উঠল দু জনে, বন্ধ হল চিৎকার। বকশী মশাই টেনে নামালেন দুটোকে কাঁধ থেকে, টানতে টানতে নিয়ে গেলেন ঘরের একধারে, গলায় চেন বেঁধে দিলেন তাদের। এই চড় মারা, কাঁধ থেকে টেনে নামানো, গলায় চেন বাঁধা কর্মগুলো সারতে যেটুকু সময় ব্যয় হল সে সময়টুকু তিনি প্রাণী দুটোকে শুয়োরের বাচ্চা হারামজাদা ইত্যাদি মধুর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করলেন।

গোলমাল থামিয়ে আমার সামনে এসে বললেন—"কি, দাঁড়িয়ে রইলেন যে ? বসুন ঐটের ওপর।" তিনটে মোষের শিঙের পায়া, ওপরটা ভাল্লুকের চামড়ায় ছাওয়া একটা অদ্ভুত জিনিসের ওপর বসলাম। বকশী মশায় বসলেন না, একটা চামড়ার টেবিলের ওপর কয়েকটা চাপড় লাগালেন। ঢাকের ওপর চড় মারলে যেমন আওয়াজ হয় তেমনি আওয়াজ হল। বেঢপ মোটা লুঙ্গি পরা একটা লোক এসে দাঁড়াল সামনে। গালের অত্যধিক মাংসের জন্যেই বোধ হয় লোকটার দুটো চোখ প্রায় বুজে আছে, বুকে পিঠে অত্যধিক লোম থাকার দরুন তার জামা গায়ে দেবার প্রয়োজনই হয় না। বকশী মশায়ের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁত বের করে সে নিঃশব্দে হাসল। হাসি বোঝা গেল, কারণ অদ্ভুত ভাবে কুঁচকে গেল তার মুখের মাংস। বকশী মশাই অবোধ্য ভাষায় হুড়হুড় করে কতকগুলো কি আওড়ালেন তার দিকে চেয়ে। শুনে দু পাশে বার কয়েক মাথা নাড়লে লোকটা। তার পর থপ থপ করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

আমার দিকে ফিরে বকশী মশায় বললেন—"জানেন, ও দুটো কি

জানোয়ার?"

সত্যিই তখন জানতাম না। ঘাড় নাড়লাম।

"উল্লুক, উল্লুকের নাম শুনেছেন কখনও?"

বললাম—"উল্লুকের বাচ্চা বলে গালাগাল দিতে শুনেছি।"

"ঠিক!" বকশী মশায় একেবারে কাছে এসে দাঁড়ালেন আমার। তার পর হিসহিস করে বললেন—"সেই উল্লুকের বাচ্চা হল ওরা, উল্লুকের বাচ্চা পুষছি আমি। কি দিয়ে ওদের বেঁধে রেখেছি জানেন? সোনার চেন দিয়ে। ওদের গলায় পরিয়েছি সোনার বকলস, কেন জানেন?" খেঁক খেঁক করে হাসতে লাগলেন অয়স্কান্ত বকশী।

উল্লুকের বাচ্চাকে সোনার চেন পরানো ব্যাপারটার মধ্যে হাসবার কি কারণ আছে বুঝতে পারলাম না। বাঁদরের গলায় মুক্তার মালা গোছের ব্যাপার। উল্লুক দুটো সোনা লোহার তফাত কি বুঝবে। বকশী মশায়ের টাকা আছে, আছে বলে উল্লুকের গলায় সোনার হার পরিয়েছেন। পরিয়ে নিজেই হেসে খুন হচ্ছেন। সবই যেন কেমন হেঁয়ালি বলে মনে হল।

হাসি থামিয়ে বকশী মশায় বললেন—"উল্লুক পুষছি, উল্লুক। সোনার চেন পরিয়েছি ওদের। কারণ ওরা নিমকহারামি করে না, নিমকহারামি করা কাকে বলে তা ওরা জানেও না। আজ পর্যন্ত দু-পেয়ে উল্লুক যে কজনকে পুষেছি, প্রত্যেকে নিমকহারামি করেছে। ভাত কাপড় সোনা দানা হীরে জহরত, কোনও কিছু দিয়েই কাউকে সন্তুষ্ট করতে পারি নি। খেয়েছে দেয়েছে নিয়েছে থুয়েছে আর শিকল কাটার মতলব ভেঁজেছে। এর পর যদি কোথাও কাউকে উল্লুকের বাচ্চা বলে গাল দিতে শোনেন তো মারবেন মুখে এক থাপ্পড়। গাল যদি দিতে হয় তো দিক, হারামজাদা মানুষের বাচ্চা বলে। খামকা ঐ নিরীহ প্রাণীদের নাম করে গাল দেয় কেন?"

উত্তেজনায় বকশী মশায়ের বুকের হাড়গুলো ওঠা-নামা করতে লাগল। ফতুয়ার পকেটে হাত পুরে একটা সোডার শিশি বার করে ডান হাতের চেটোয় খানিক ঢেলে মুখে ফেলে দিলেন। দিয়ে চোখ বুজে মুখ নেড়ে নেড়ে সে ডাটা গিলতে চেষ্টা করতে লাগলেন।

সেই লোমশ মাংস-পিণ্ডটা ফিরে এল হাতে একখানা কাঠের থালা নিয়ে। থালাখানা নিয়ে এসে দাঁড়াল আমার সামনে।

দেখি, মস্ত একটা কাঁচের গেলাস ভরতি দুধ আর কয়েকটা কলা রয়েছে থালায়। সোডা গিলে বকশী মশায় চোখ চেয়ে বললেন—"নিন থালাটা, ওগুলো খান। তার পর শুনব আপনার কথা। এ শালার সঙ্গে কোথায় দেখা হল আপনার? করছে কি এখন সে? আজকাল দেখতে হয়েছে কেমন তাকে? তা হলে এখনও মনে রেখেছে দেখছি শালা আমাকে! দেখছি সব শালাই নিমক-

হারাম নয়।" খেঁক খেঁক খেঁক খেঁক হাসি শুরু হয়ে গেল আবার।

অনর্গল শালা শুনতে শুনতে মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল—"গালাগাল দিচ্ছেন কেন ভদ্রলোককে? তিনি তো আপনাকে খুব শ্রদ্ধা করেন বলে মনে হল।"

অয়স্কান্ত বকশীর হাসি বন্ধ হল। এক মিনিট চোখ পিটপিট করে চেয়ে রইলেন আমার মুখের দিকে। তার পর দু হাতে দুই বুড়ো আঙ্গুল উঁচিয়ে আমার মুখের সামনে বাড়িয়ে ধরে বললেন—"এই কচু বুঝলেন আপনি। গালাগাল দিলুম! গালাগাল দেওয়া হল কিসে? মাগের ছোট ভাইকে শালা না বলে গুরুঠাকুর বলতে হবে নাকি?"

খুবই অপ্রতিভ হয়ে বললাম—"ও তাই নাকি! জানতাম না যে আপনি তাঁর ভগ্নীপতি। কিছু মনে করবেন না।"

"ও! সে বুঝি বলেও নি যে আমি তার কে! মানে আমার পরিচয়টা দিতে অপমান মনে করলে বুঝি?" বকশী মশায়ের গলার আওয়াজ ভারী হয়ে উঠল।

তাড়াতাড়ি বললাম—"আজ্ঞে না, সে ফুরসতও পান নি তিনি। এক মিনিটের মধ্যে চিঠিখানা আমার হাতে গুঁজে দিয়ে সরে পড়লেন কিনা, আলাপ করার উপায় ছিল না তখন। এমন কি যিনি ঐ চিঠি আমায় দিয়েছেন তাঁর নামও আমি জানি না।"

"ও তাই নাকি! আশ্চর্য ব্যাপার তো! আচ্ছা খান আপনি আগে, তার পর শুনব সব কথা। এখন আমি একটু সময় টানটান হয়ে শোব, সামান্য এই পাঁচ মিনিট। আপনি খান।"

বলতে বলতে বকশী মশায় সেইখানেই মেঝেয় বাঘছালের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে চোখ বুজলেন। মনে হল যেন দাঁতে দাঁত চেপে একটা অসহ্য যন্ত্রণা চাপবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করছেন তিনি। কি আর করব তখন, একটা কলা ছাড়িয়ে কামড় দিলাম।

॥ চার ॥

কলা খেতে কারও গলা ব্যথা করে না।

কদলীর তুল্য নির্ভেজাল পবিত্র বস্তু আর কি আছে! তাই ঠাকুর-দেবতার নৈবেদ্যে কদলী না দিলে সে নৈবেদ্য অগ্রাহ্য। কারও পিণ্ডি চটকাতে হলেও কদলী চাই। বরণডালায় কদলী দিতে হয় আস্ত এক ছড়া। কাউকে যদি কিছু দেখাবার প্রয়োজন হয় তো কদলীই হল সর্বোত্তম প্রদর্শনীয় সামগ্রী।

পানীয়ের মধ্যে দুগ্ধ হল পবিত্রতম পানীয়। দুগ্ধপোষ্য শিশুও জানে এ

কথা। কিন্তু এই দুটি অতি পবিত্র খাদ্য আর পানীয় এক সঙ্গে পরিবেশিত হলে সেটা তখন মানুষের ব্যবহারের উপযুক্ত থাকে কিনা, এ সম্বন্ধে আমার ঘোরতর সন্দেহ আছে। দুধ-কলা এক সঙ্গে দেখলেই আমার মনে পড়ে যায় বিপদ্‌ভঞ্জনের পিসীকে। ভাইপোটি ছিল পিসীর চোখের মণি। একদা পিসীকে বিপদ থেকে উদ্ধার করার বাসনা হল ভাইপোর। পিসীর হাতবাক্সটি ভেঙে পিসীকে কলা দেখিয়ে ভাইপো বিপদ্‌ভঞ্জন উধাও হলেন। তার পর যত কাল বেঁচেছিলেন পিসী, রোজ দু বেলা বুক চাপড়ে কেঁদে পাড়া মাথায় করতেন—"ওরে, আমি দুধ-কলা দিয়ে সাপ পুষেছিলুম রে—"

দুধ-কলা এক সঙ্গে দেখলেই আমার মনে পড়ে যায় সেই ছোটবেলায় শোনা বিপদ্‌ভঞ্জনের পিসীর কান্না। তৎক্ষণাৎ চোখের সামনে ফণা তুলে দাঁড়ায় গোখরো কেউটের বংশধরেরা। কাজেই দুধ-কলা আমার খাওয়া হল না। সভয়ে চেয়ে রইলাম দুধের গেলাসটার দিকে, এই বুঝি সাপ এসে মুখ ডোবাল গেলাসটায়। দেওয়ালের গায়ে যে সব বিচিত্র সাপের চামড়া ঝোলানো ছিল সে-গুলো যেন আস্তে আস্তে নড়েচড়ে উঠল। মুখ ফিরিয়ে বকশী মশায়ের পানে তাকালাম। তাঁর দেহ-যষ্টিখানি তখন বেঁকেচুরে তেউড়ে নানারকম ভঙ্গি ধারণ করছে। যেন কোনও অদৃশ্য হস্ত ধীরেসুস্থে অতি মোক্ষমভাবে মোচড় দিচ্ছে তাঁকে ধরে, রসকষ এতটুকু অবশিষ্ট থাকতে কিছুতেই নিষ্কৃতি দেবে না। বুঝতে পারলাম এইভাবে নিঙ্‌ড়ে নিঙ্‌ড়েই বকশী মশায়কে একেবারে ছিবড়ে করে ফেলা হয়েছে। তাই উনি উল্লুকের গলায় সোনার চেন পরান, খেঁক্ খেঁক্ করে কদর্য হাসি হাসেন। বলেন—"ভাত-কাপড় সোনা-দানা হীরে-জহরত কোনও কিছু দিয়েই কাউকে সন্তুষ্ট করতে পারি নি। খেয়েছে দেয়েছে নিয়েছে থুয়েছে আর শিকল কাটার মতলব ভেঁজেছে।"

অর্থাৎ জীবনে উনি বহু কলা বহুবার বহুভাবে দেখেছেন। হয়তো অত্যধিক কলা দেখার জ্বালা সহ্য করতে হয়েছে বলেই আজ এই দশা ওঁর। অয়স্কান্তর আকর্ষণ-শক্তি থাকলে কি হবে, যা আকর্ষণ করে তা লোহা লোহার বুক চিরে ছিটেফোঁটা রসকষ মেলে না, তাই অয়স্কান্তর চামড়াখানা পর্যন্ত শুকিয়ে কুঁচকে বিশ্রী হয়ে গেছে।

বকশী মশায়ের শুকনো চামড়া ঢাকা হাড়গুলো মড়মড় করতে লাগল। দেখতে দেখতে আমার হাত-পাগুলোও কেমন আড়ষ্ট হয়ে গেল, নিশ্বাস নিতেও কষ্ট হতে লাগল। নির্ভেজাল সাকার বেদনা আচ্ছন্ন করে ফেললে আমার নড়াচড়া করার শক্তিটুকু। পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত যন্ত্রণায় টনটন করতে লাগল আমারও। উঠে গিয়ে ওঁকে ধরে বসা না কি করব ঠিক করতে পারলাম না। এ অবস্থায় কি করা কর্তব্য তারও কোন ধারণা ছিল না। কাঠ হয়ে বসে রইলাম বকশী মশায়ের দিকে চেয়ে আর যন্ত্রণা ভোগ করতে

লাগলাম।

নজরে পড়ল ঠোঁট নাড়ছেন যেন বকশী মশায়। বিড়বিড় করে কি যেন আওড়াতে লাগলেন তিনি। সেই আওয়াজ কানে যেতে আমার হাত-পায়ের আড়ষ্ট ভাবটা কাটল। উঠে গিয়ে ওঁর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"কি বলছেন ? ডাকব কাউকে ? ও বকশী মশায়—বকশী মশায়—"

কে জবাব দেবে !

শুনতে পেলাম দাঁত কড়মড় করছে বকশী মশায়ের। দেখতে পেলাম দুই কশ বেয়ে গাঁজলা ভাঙাছে। নাক-মুখ দিয়ে হঠাৎ প্রচন্ড বেগে একটা নিঃশ্বাস ছাড়লেন তিনি। নিঃশ্বাসের ঝাপটায় দু পা পিছিয়ে যেতে হল আমাকে। অনেকটা গাঁজলা ছিটকে এসে পড়েছে আমার মুখ-চোখের ওপর। অন্ধকার দেখছি তখন চোখে।

চাদর দিয়ে মুছে ফেললাম চোখ মুখ। চোখ খুলতেই নজর পড়ল বকশী মশায়ের চোখের ওপর। বকশী মশায় তাকিয়ে রয়েছেন ! কি ভয়ঙ্কর চাউনি ! চোখের তারা দুটো যতদূর সম্ভব উঠে গেছে ওপর দিকে, তারার নীচের সাদা অংশে রক্তের লেশমাত্র নেই। সে দৃষ্টিতে প্রাণও নেই যেন। হঠাৎ দেখি সেই অস্বাভাবিক চাউনি সুদ্ধ তাঁর মুখখানা আস্তে আস্তে ওপর দিকে উঠে আসছে। গলা বুক সব উঠতে লাগল। কোমর থেকে পা পর্যন্ত ঠেকে রইল মেঝের সঙ্গে। কোমর থেকে মাথা পর্যন্ত যেন কাঠ একখানা, আস্তে আস্তে সিধে হয়ে উঠল ওপর দিক। বকশী মশায় কোমর পিঠ ঘাড় মাথা টানটান করে পা ছড়িয়ে বসে রইলেন সেই ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে নিজের কপালের দিকে তাকিয়ে। একটিবারের জন্যও কাঁপল না তাঁর চোখের পাতা, এমন কি শ্বাস-প্রশ্বাস বইছে কিনা তাও বোঝা গেল না।

দুনিয়াসুদ্ধ জন্তু-জানোয়ারের ছাল-চামড়া হাড়গোড় দিয়ে সাজানো সেই প্রায়ান্ধকার ঘরখানার মধ্যে দাঁড়িয়ে মনে হল, আমিও মরে গেছি। মরণের ওপারের রাজত্বে পেঁৗছে চাক্ষুষ দেখছি পারলৌকিক কান্ড-কারখানা। প্রেতের দৃষ্টি দিয়ে প্রেতলোকের গুহ্যাতিগুহ্য রহস্য পড়তে লাগলেন বকশী মশায়। সেই দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। চেঁচিয়ে কাউকে ডাকব বা ছুটে বেরিয়ে যাব ঘর ছেড়ে এমন সামর্থ্যও রইল না।

অনেকক্ষণ পরে, কতক্ষণ পরে হিসেব করার মত অবস্থা ছিল না আমার তখন, কানে গেল অদ্ভুত একটা গোঁ গোঁ শব্দ। ঠাওর করে বুঝতে পারলাম শব্দটা উঠছে বকশী মশায়ের ভেতর থেকে। কাছে এগোতে সাহস হল না আর, সেখানে দাঁড়িয়েই কান খাড়া করে বোঝাবার চেষ্টা করলাম কি বলছেন উনি।

হাঁ, বলছেন। আস্তে আস্তে চিবিয়ে চিবিয়ে সেই গোঁ গোঁ শব্দের সঙ্গে বেরুতে লাগল একটি বর্ণনা। শুনে মাথার চুল পর্যন্ত খাড়া হয়ে উঠল আমার।

তাজ্জব ব্যাপার—একেবারে ভূতুড়ে কাণ্ড! সেই প্রেতের চাউনি দিয়ে সব কিছু পর পর প্রত্যক্ষ করতে লাগলেন আর বলে যেতে লাগলেন বকশী মশায়। কবে কখন চট্টগ্রাম থেকে আমরা স্টীমারে চেপে আদিনাথ দর্শনে বেরই, স্টীমারখানার নাম, কে কে ছিল স্টীমারে, কি কি ঘটেছিল স্টীমারের ওপর। এমন এক জন লোক, যার একখানা পা নেই, সে বগলের ঠেঙা দিয়ে ঠেঙিয়েছিল মগেদের, সে লোকটাও নেমেছে কক্সবাজারে, বসে আছে এখন কালী মন্দিরের বারান্দায় —সব কিছু যেন পড়ে গেলেন বকশী মশায়—সেই অদ্ভুত দৃষ্টিতে নিজের কপালের দিকে তাকিয়ে। হঠাৎ ঝপ করে বন্ধ হল তাঁর গলা, কয়েক মুহূর্ত পরেই প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠলেন—"মার মার, খাল খুলে দে জুতিয়ে। আমার সঙ্গে চালাকি করতে এসেছে রে শালা! মার—মার—"

সভয়ে চতুর্দিকে তাকাতে লাগলাম। কে চালাকি করতে এল! কার খাল খুলতে হবে! কোন্ শত্রুর ওপর অমন ক্ষেপে উঠলেন উনি?

কাউকে দেখতে পেলাম না ঘরে। আবার ফিরে তাকালাম বকশী মশায়ের দিকে। দম ফুরিয়ে গেছে তখন, চোখ বুজে এসেছে, আস্তে আস্তে ডান পাশে ঢলে পড়লেন বকশী মশাই। কুণ্ডলী পাকিয়ে গেলেন একেবারে, পা মুড়ে হাঁটু দুটো বুকের সঙ্গে ঠেকিয়ে ফেললেন, মাথাটাও নুয়ে এসে ঠেকে গেল হাঁটুর ওপর। বেশ কিছুক্ষণ থরথর করে কাঁপল তাঁর দেহটা। তার পর নিঃসাড় নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

আমার তখন হুঁশ জ্ঞান পর্যন্ত নেই, ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম সেই তালগোল পাকানো দেহটার দিকে।

"সরুন তো একটু, যেতে দিন আমাকে—"

ভয়ানক চমকে উঠে ঘুরে দাঁড়ালাম। এক জন এসে দাঁড়িয়েছে দরজার এধারে। বাইরের আলো পড়েছে তার পেছনে, সামনেটা অন্ধকার।

এক জন মানুষই বটে, রক্ত-মাংসে গড়া এক জন মানুষ এসে দাঁড়িয়েছে ঘরের ভেতর। রক্ত-মাংসের মানুষের গলাই শুনতে পেলাম কানে। আবার ফিরে এলাম মরণের এপারে। তাড়াতাড়ি সরে দাঁড়ালাম এক পাশে। রক্ত-মাংসে গড়া জীবন্ত মানুষ এগিয়ে এল, বকশী মশায়ের মাথার কাছে গিয়ে বসে পড়ল। তাঁর কপালে হাত দিয়ে নাকের সামনে হাত রেখে কি দেখল। তার পর আমার দিকে মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করল—"কতক্ষণ হয়েছেন এরকম?"

গোটা দু-তিন ঢোক গিলে গলাটাকে যতটা সম্ভব ভিজিয়ে নিয়ে কোনও রকমে জবাব দিলাম—"তা—তা অনেকক্ষণ হবে বৈকি।"

জবাব পাবার আশায় বোধ হয় প্রশ্ন করা হয় নি, জবাব শোনার আগেই নুয়ে পড়ল সেই জীবন্ত মানুষটি বকশী মশায়ের মুখের ওপর। কে ও! ভাল

করে তার মুখ দেখবার আশায় চোখ কুঁচকে দাঁড়িয়ে রইলাম।

অবশেষে চিনতে পারলাম। বকশী মশায়ের মাথার কাছে বসে আছে এক নারী, মায়া-মমতা হাসি-কান্নায় গড়া এক মানবী মূর্তি বকশী মশায়ের মাথাটা তুলে নিয়েছে নিজের কোলের ওপর। নিয়ে বকশী মশায়ের কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। বকশী মশায়ের পোড় খাওয়া মুখখানার চেহারা বদলাতে লাগল, বোজা চোখের কোণ বেয়ে জল গড়াতে লাগল। করুণাময়ী মূর্তি আঁচল দিয়ে সেই জল মুছিয়ে নিলে। লম্বা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বকশী মশায় পা ছড়ালেন, শেষে দু হাতে ভর দিয়ে উঠে বসলেন। দু চোখ কচলে তাকালেন শূন্যদৃষ্টিতে আমার পানে। কয়েক মুহূর্ত লাগল আমাকে চিনতে। একটু লজ্জিত হয়ে উঠলেন যেন, বললেন—"ওঃ অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছি তা হলে--না! তা আপনি ও ভাবে দাঁড়িয়ে কেন? বসুন বসুন, আসছি আমি চোখে মুখে জল দিয়ে—"

বলতে বলতে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেন বকশী মশায়। পারলেন না, আর একটু হলেই ঘুরে পড়তেন। পেছন থেকে দুখানি হাত তৎক্ষণাৎ তাঁকে ধরে ফেললে। তখন তাঁর নজর পড়ল পেছন দিকে। বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আর একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—"ওঃ তুমি! তা হলে কি আবার—"

প্রশ্নটা শেষ করতে পারলেন না বকশী মশায়, টপ করে মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে এক বার তাকালেন। তাঁর কপালের চামড়া কোঁচকাতে লাগল। মাথা নীচু করে কোলের ওপর নজর রেখে কি যেন কি ভাবতে লাগলেন।

অর্জুনতনয় অভিমন্যু ব্যূহ প্রবেশ করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু বেরিয়ে আসার কায়দাটুকু জানা না থাকার দরুন তাকে নিদারুণ মূল্য দিতে হয়। আমার অবস্থাটা অভিমন্যুর মত হয়ে দাঁড়াল। যাত্রাদলের অভিমন্যু শেষ দৃশ্যে ছুটোছুটি লম্ফঝম্ফ করে অনেক রকম কসরত দেখিয়ে 'হা পিতা—পিতা—পিতা' বলতে বলতে প্রাণত্যাগ করতে ছুটে গিয়ে ঢোকে সাজঘরে। আমি বেচারা না করতে পারলাম ছুটোছুটি, না পারলাম 'বাপ রে মা রে' বলে লোক ডাকতে। সাজঘরটা কোন্ দিকে জানা না থাকায় সেই হাড়-চামড়া ভর্তি ঘর থেকে ছুটে বেরতেও পারলাম না। বেরিয়ে যাবই বা কোথায়! কোনওক্রমে সেই আসল গেটটা পার হয়ে রাস্তায় পড়তে পারলে নিস্তার পাওয়া যায়। কিন্তু সেই গেট পর্যন্ত পৌঁছব কেমন করে! আসবার সময় অয়স্কান্তর পেছন পেছন কোন্ দিক দিয়ে কটা ঘর দালান উঠোন যে পেরিয়ে এসেছি তাও ছাই মনে পড়ল না। তা ছাড়া সেই সর্বনেশে কুকুরগুলোকে যদি এতক্ষণে আবার ছেড়ে দেওয়া হয়ে থাকে কিংবা আরও কোনও বিদ্ঘুটে জাতের প্রাণীর সঙ্গে যদি সাক্ষাৎ ঘটে যায় ঘর থেকে বাইরে পা দিলেই! এই সমস্ত সাত পাঁচ বিবেচনা করে পালাবার

আশাটা মন থেকে তাড়ালাম।

ওধারে সন্ধ্যা পার হয়ে গেল। ব্রহ্মচারীকে কিছুই বলে আসি নি, এতক্ষণ যে আটকে থাকতে হবে অয়স্কান্তর আকর্ষণে, আন্দাজ করতে পারি নি। কক্সবাজারের অয়স্কান্ত সম্বন্ধে নানাজনের কথা শুনে জিদ্ চেপে গিয়েছিল, অয়স্কান্ত মণি না দেখে কক্সবাজার ছেড়ে যাওয়াটা নেহাত লোকসান হবে বলে মনে হয়েছিল, তা ছাড়া সেই নাতজামাইয়ের চিঠির জোরে অয়স্কান্ত যদি কক্সবাজার ছাড়ার একটা ব্যবস্থা করে দেন, এ আশাও ছিল মনের কোণে। কিন্তু কি করে জানব তখন যে অয়স্কান্তর পাল্লায় পড়া আর প্রেতলোকে উপস্থিত হওয়া এক কথা। ঘুণাক্ষরেও টের পাই নি যে অয়স্কান্ত প্রেতের দৃষ্টি দিয়ে দেখেন, প্রেতের হাসি হাসেন, প্রেতের যাতে তৃপ্তি হয় এমন ভাবে ঘর সাজান মরা জন্তু-জানোয়ারের হাড় চামড়া দিয়ে। পারলৌকিক পাকচক্রে পড়ে যাব এ ধারণা করতে পারলে কি অয়স্কান্ত-দর্শনে পদক্ষেপ করতাম কিছুতে? গেরো আর কাকে বলে!

গোঁজে বাঁধা গরুর মত ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম অয়স্কান্তর দিকে তাকিয়ে। ঘাড় হেঁট করে বসে কি যে তিনি ভাবতে লাগলেন তা তিনিই জানেন। আমি তখন প্রতি মুহূর্তে আশা করছি যে এবার অন্তত একটা আলো আনতে হুকুম দেবেন ওঁরা কাউকে। দিনের আলো নিভে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ঘরখানা ক্রমশঃ সত্যিকারের মৃত্যুপুরী হয়ে দাঁড়াল, তিন জন জ্যান্ত মানুষের নিঃশ্বাস পড়ছে বলেও মনে হল না।

শেষে কানে গেল খুব নরম একটি অনুরোধ।

"চল, ওঠ এবার, মুখে মাথায় জল দিতে হবে।"

মানুষের গলার আওয়াজ! মানুষের গলার আওয়াজ তেমন তেমন অবস্থায় পড়লে কত মিষ্টি শোনায়! সমস্ত শরীরের ভেতর একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ ছুটে গেল সেই কথা কটি শুনে। আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে আমিই আগে খোলা দরজা দিয়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। একটু পরে অয়স্কান্তও বেরিয়ে এলেন। বেরিয়ে এলেন টলতে টলতে তাঁর কাঁধে ভর দিয়ে। তাঁর মানে সেই নারীর। কোথা থেকে বাইরের বারান্দায় এক ফালি তীব্র আলো এসে পড়েছিল। সেই আলোয় এতক্ষণ পরে স্পষ্ট দেখতে পেলাম সেই নারী-মূর্তিটিকে।

চেহারা আকৃতি অবয়ব রূপ দেহ মূর্তি—এ কথাগুলির অর্থ একই বটে, কিন্তু ব্যবহারের বেলায় মূর্তিটিকে চেহারা বা চেহারাওয়ালার আকৃতিটাকে রূপ বা কারও রূপ দেখে চোখ ঝলসে গেলে তখন সেটাকে আকৃতি বলা চলে কিনা, সেটা ভাববার কথা। সেই আলোর ফালিটুকুতে যেটুকু সেদিন সহসা নজরে পড়ে গেল আমার—তার সবটুকুই নারী। রূপ সে নারীদেহে ছিল কিনা

তার হিসেব করার অবসর ছিল না তখন, তেমন মেজাজও ছিল না। আকৃতি অবয়ব কেমন সেই দেহটির—তাও দেখার সুযোগ হল না, প্রয়োজনও ছিল না। সেই নারী-মূর্তিটি কিন্তু মনের চোখে আঁকা হয়ে গেল আমার। দেহের চোখ বুজলে মনের চোখে এখনও সে মূর্তিটিকে স্পষ্ট দেখতে পাই।

নারী পুরুষের দেহে মনে নিশ্চয়ই অনেক ফরক আছে, সাজে পোশাকে রূপে ব্যবহারে তো আছেই। তাই নিয়েই পুরুষের পুরুষত্ব, নারীর নারীত্ব। কিন্তু এ সমস্ত ছাড়াও এমন একটি বস্তু আছে নারীর, অবশ্য সব নারীর তা নেই, যে বস্তু থাকার দরুন সেই নারীরূপ চোখে পড়লেই চোখ জুড়িয়ে যায়। মনটা এক অপার্থিব স্নিগ্ধ আলোয় ভরে ওঠে, আর বুকের মধ্যে জমে ওঠা অনেক দিনের অনেক হা-হুতাশ জ্বালা-যন্ত্রণা সব এক নিমেষে উধাও হয়ে উবে যায়।

আমারও তাই হল। পালাই পালাই ডাক ছাড়ছিলাম ভেতরে ভেতরে, পালাবার কথাটা ভুলেই গেলাম একেবারে। প্রেতের মত মনে হচ্ছিল বকশী মশায়কে, তখন যাকে দেখলাম সেই নারীমূর্তির কাঁধে হাত দিয়ে বেরিয়ে আসতে, তাকে দেখে ব্যথায় টনটন করে উঠল বুকের ভেতরটা। আহা, কি অসহায়! কি অমানুষিক যন্ত্রণা ভোগ করে বেচারা! যে বাড়িকে এতক্ষণ মনে হচ্ছিল ভয়াবহ যমপুরী, সে বাড়িটাও বড় মনোরম স্থান বলে বোধ হল। সেই অবস্থায় ওঁদের ছেড়ে যাওয়ার চিন্তাটা মনের কোণেও উদয় হল না। তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে বললাম–"দিন, আমায় দিন, আমি তুলে নিয়ে যাচ্ছি বকশী মশায়কে।"

বকশী মশায় এ পাশের হাতখানা আমার কাঁধে তুলে দিলেন। অনেকটা সোয়াস্তির সুর যেন ফুটে উঠল তাঁর গলায়। বললেন—"মিছিমিছি অনেক কষ্ট পেলে ভাই তুমি, প্রথম বার আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে ভয়ানক বিপদে পড়ে গেলে—"

বললাম—"না না, কিছু নয়, ও সব কিছু ভাববেন না আপনি।"

ওপাশ থেকে আর এক বার শুনতে পেলাম সেই অপরূপ কণ্ঠ—"একটু সাবধানে নামাতে হবে এই সিঁড়ি কটা। খুব সাবধান।"

সাবধান হলাম। সাবধানে বকশী মশায়কে নামিয়ে আনলাম উঠোনে।

উঠোন পেরিয়ে ঢুকলাম একটা পাকা দালানে। অয়স্কান্ত বকশীর অন্দর-মহলে, অন্দর-মহলটা কাঠের তৈরী নয়।

॥ পাঁচ ॥

কক্সবাজারের অয়স্কান্ত বকশীর আস্তানা থেকে সেদিন অনেক রাতে বিদায়

নিয়েছিলাম। এইটুকুই শুধু এখন মনে পড়ছে যে রাত তখন অনেকটা পার হয়ে গিয়েছিল, রাস্তায় মানুষ-জন একরকম ছিল না বললেই হয়, আর আকাশে বেশ মেঘ করেছিল। মেঘ করার দরুন বিদ্যুতও বোধ হয় চমকাচ্ছিল। সব আয়োজন প্রস্তুত হয়ে উঠেছিল ঝড়কে অভ্যর্থনা করার জন্যে। তাই আমি বেশ মন দিয়ে পথ চিনে চিনে এগিয়ে চলেছিলাম ব্রহ্মচারী সনাতন শর্মার কাছে। তাড়াতাড়ি পৌঁছনোর দরকারও ছিল, ঝড়-বৃষ্টি এলে এক ঠ্যাং নিয়ে ব্রহ্মচারী খুবই মুশকিলে পড়ে যাবেন।

সামলাবার মত অবশ্য তেমন কিছু ছিলও না, শুধু একখানা কালো কম্বল আর ঘটিটা ছাড়া। ব্রহ্মচারীর জিনিসপত্র ওঁর অঙ্গেই বাঁধা থাকে প্রায় সর্বক্ষণ, ঝড়-বৃষ্টি এলে আমার কম্বলখানা হয়তো ভিজবে। সে জন্যেও ভয় নেই, ঝড়-বৃষ্টির পর রোদ উঠবেই, তখন কম্বল শুকনো করা যাবে। কিন্তু স্বয়ং ব্রহ্মচারী ভিজবেন যে। এক ঠ্যাং নিয়ে তিনি নিজেকে সামলাবেন কোথায়! এই ভয়েই হাঁটতে লাগলাম তাড়াতাড়ি।

হাঁটতে হাঁটতে আবার মনে পড়ে গেল বকশী মশায়ের কথা। বকশী মশায় বেওয়ারিস মাল নন। ওঁকে সামলাবার জন্যে দয়াময় ভগবান উপযুক্ত ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। দুখানি হাত, দুটি চক্ষু আর দাঁতে দাঁতে টেপা একখানি আনত মুখ সদাসর্বক্ষণ প্রস্তুত হয়ে রয়েছে বকশী মশায়ের জন্যে। ভূত, প্রেত, পেটের ব্যথা, যম, কারও সাধ্য নেই সেই নিরাভরণ হাত দুখানির নাগালের বাইরে বকশী মশায়কে ছিনিয়ে আনার। বিষাক্ত সাপ, ক্ষুধার্ত নেকড়ে বা খুনে মগ, এদেরও সাহস হয় না সেই পাথরের মত চক্ষু দুটির অতি শীতল দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে অয়স্কান্তর শরীরে আঘাত হানবার। তাই বকশী মশায় দুনিয়াকে কেয়ার করেন না, বাড়ির বাইরে বেরোন না, যা মুখে আসে তা অনায়াসে বলে ফেলেন লোকের মুখের ওপর। কিন্তু এত পেয়েও অয়স্কান্ত সন্তুষ্ট নন। সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিটার বিরুদ্ধেই তাঁর চরম অভিযোগ। নিমকহারামি করে না শুধু উল্লুকে, এইজন্যে তিনি উল্লুকের গলায় সোনার চেন পরান। এর সবটুকুই হল বেহদ্দ হেঁয়ালি। যে হেঁয়ালির মর্মোদ্ভেদ করতে না পারা পর্যন্ত অয়স্কান্ত বকশীর কিছুই জানা হল না। হাঁটতে হাঁটতে মনে হল, শুধু হাতে ফিরে চললাম বকশী মশায়ের কাছ থেকে। অনর্থক সেই বিকেল থেকে রাত শেষ পর্যন্ত ভূতের বেগার খেটে মলাম। গোটাকতক টাকা ছাড়া আর কিছুই মিলল না।

মায় বিদায়টুকু পর্যন্ত পেলাম না।

নেওয়া-দেওয়ার কারবারে বিদায় জিনিসটা হচ্ছে এমন সূক্ষ্ম বস্তু, যার ওজনের এতটুকু হেরফের হলে লাভ-লোকসানের আর সীমা পরিসীমা থাকে না। বিদায় দিতে ছোট্ট একটু মুখের কথা—'আবার এস কিন্তু' বা ভাষাহীন

একটু বোবা চাউনি, লাভের অঙ্কটাকে এত ভারী করে তুলতে পারে যে সে বোঝা বয়ে পথ চলাই মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়। আবার জনসমুদ্র জুটিয়ে গালভরা অভিনন্দন-বাণী পাঠ করে ঢাক ঢোল পিটিয়ে বিদায় দিলেও সে বিদায় মন থেকে মুছে যেতে কয়েকটা মুহূর্তও লাগে না। বিদায়ের লেনদেন কখন কি প্রথায় সম্পন্ন হলে সেটা সার্থক কারবার হয়ে দাঁড়ায়, তা ব্যাখ্যা করে বোঝানো সত্যিই শক্ত।

বকশী মশায়ের ওখান থেকে সে রাতের বিদায়পর্বে না ছিল ফিরে যাবার জন্যে ছোট্ট অনুরোধ, না ছিল শোরগোল সহকারে আবার না ফেরার জন্যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ—যার আসল নাম বিদায়-অভিনন্দন। যাকে সাদা কথায় বলা উচিত—গা ঢাকা দেওয়া—আমাকে তাই দিতে হয়েছিল। টাকা কটা হাতে গুঁজে দিয়ে একটি ছোট্ট অনুরোধ—যাবার সময় টাকাগুলো ফেলে যাবেন না কিন্তু। এই সামান্য কথা কটি শুনতে পেলেও অনেক কিছু পাওয়া হত। কিন্তু না, কিছুই পেলাম না, শুধু সেই টাকা কটাই রইল আমার চাদরের খুঁটে বাঁধা। সেই চাদরে মুখ মাথা ঢেকে কাউকে না জানিয়ে চুপি চুপি বেরিয়ে পড়লাম বকশী-বাড়ি থেকে। আকাশে তখন ঝড় উঠেছিল, বিদ্যুতও চমকাচ্ছিল বেশ। ওখানে বকশী মশায়কে সামলাবার জন্যে রয়ে গেল দুখানি হাত, দুটি চক্ষু, একখানি আনত মুখ। বেশ নিশ্চিন্ত মনেই পথ চিনে চিনে মাথা হেঁট করে হাঁটছিলাম। মাত্র একখানা ঠ্যাং নিয়ে ব্রহ্মচারী হয়তো বিপদে পড়বেন এই ভয়ে বেশ নিশ্চিন্ত মনে এগিয়ে চলেছিলাম তাঁর কাছে। ব্রহ্মচারী যে আমার মতই বেওয়ারিস মাল।

আকাশে যখন ঝড় ওঠে, বিদ্যুত চমকায় আর ঠান্ডা বাতাস চোখে মুখে হাত বুলিয়ে একটু সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে—তখন বেওয়ারিস মালেদেরও বিপদ ঘটে। অনেকের ধারণা, কাপড়খানা ফ্যাকাশে লাল করে নিতে পারলেই আর খোলা আকাশের তলায় ঘর বাঁধলেই বুঝি দুনিয়ার যাবতীয় লেনদেনের কারবারে একেবারে ইতি হয়ে গেল। তখন সেই ফ্যাকাশে লাল কাপড়ের তলায় যে জীবটা চলে ফিরে বেড়ায় তার মনের রঙ একেবারে এমন কালো হয়ে যায় যে তাতে অন্য কোনও দাগ পড়লেও তা চেনার উপায় থাকে না। এ ধারণা যাঁদের, তাঁরা খারাপ মানুষ নন, তবে একটু বেশী তাঁরা আশা করেন। তাঁরা হয়তো মানতে চান না যে, মাঝে মাঝে এই জগতে ঝড় ওঠে, বৃষ্টি নামে, আরও অনেক রকম সব ওলোটপালোট হয়। এই সব গন্ডগোল না ঘটে দুনিয়াটা যদি একই নিয়মে চলত, শুধু দিনের পরে রাত আর রাতের পরে দিন যদি অনবরত নিয়ম-মাফিক আসত আর যেত তা হলে ঘরছাড়া ফ্যাকাশে কাপড়-পরা জীবগুলোর জীবনেও এতটুকু দোলা লাগত না। কিন্তু তা যে হবার উপায় নেই,

অয়স্কান্তরা যে খাঁটি গেড়ে বসে আছেন এখানে ওখানে। কাজেই পথ চলতে গিয়ে বারবার এইসব অয়স্কান্তদের আকর্ষণে আটকা পড়ার ভয়। আটকা না পড়লেও সে আকর্ষণ এমন ভাবে টানাটানি জুড়ে দেয় পেছন থেকে যে বেও-য়ারিস মালেদেরও হিমশিম খেয়ে মরতে হয়। আর অমনি আকাশে ওঠে ঝড়, চমকায় বিদ্যুৎ, ঠান্ডা বাতাস চোখে মুখে হাত বুলিয়ে দিয়ে কি যেন কি বলতে গিয়ে বলতে পারে না।

বকশী মশায় ঘুমিয়ে পড়ার পর তিনিও কি কিছু বলতে চেয়েছিলেন আমাকে! আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি নি। কয়েক বার বকশী মশায়ের মুখেই শুনেছিলাম তাঁর নামটি। তিনি তাঁকে ডেকেছিলেন অনু বলে। "অনু, এঁকে কয়েকটা টাকা দিও ইনি যখন যাবেন", এই শেষ কথা বলে বকশী মশায় ঢুলে পড়েছিলেন তাঁর কোলের ওপর। অত বড় ধকলের পর সজ্ঞানে বেশীক্ষণ থাকবার মত শক্তি তাঁর ফুরিয়ে গিয়েছিল। তার পর অনেকটা সময় সেই অনু নীরবে বকশী মশায়ের কপালে হাত বুলোতে লাগলেন। ঘরের কোণে একটা চেয়ারের ওপর বসে ঠায় তাকিয়ে রইলাম তাঁর পানে আমি। ঘরের আলো কমানো হয় নি। কাজেই খুবই ভাল করে দেখে নিয়েছিলাম সেই অনুকে। অনুপমা অন্নপূর্ণা অনুরাধা কি থেকে যে সেই অনুর উৎপত্তি তাই আমি ভাবছিলাম বসে বসে। অনেক ভেবে আমি ঠিক করে ফেলেছিলাম যে অন্তঃসলিলা থেকে ঐ অনুর সৃষ্টি। তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তাই আমার মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল যেন কর্ণফুলীর মত একটা গভীর জলের নদী নীরবে নিঃশব্দে বয়ে চলেছে সেই ছোট্ট অনুর বুকের ভেতরে। পাছে সেই নদীর ঢেউ দেখে কেউ ভয় পেয়ে যায় এই জন্যে তিনি সাবধানে নিজের চক্ষু দুটিকে এমন ভাবে নামিয়ে আড়াল করে রাখেন যে কোনও মানুষ কখনও ওঁর নজরে পড়ার ফুরসতই পায় না। কারও দিকে চোখ তুলে উনি তাকানও নি বোধ হয় জীবনে। যেন সে প্রয়োজন ও'র মিটে গেছে চিরকালের মত। মিটে গেছে বলেই লেগে রয়েছেন অয়স্কান্তর সঙ্গে। নিজেকে সব জাতের আকর্ষণের হাত থেকে ছিনিয়ে আনতে না পারলে ওভাবে ঐ প্রেতপুরীর মধ্যে প্রেতলোকের অয়স্কান্তর সঙ্গে কাটানো কিছুতেই সম্ভব নয়। একটিবার যদি অন্তঃসলিলার আসল রূপটা একটু নজরে পড়ে, এই আশায় প্রায় দম বন্ধ করে তাঁর দিকে তাকিয়ে আমি বসে রইলাম।

অনেকক্ষণ কেটে গেল এক ভাবে, মড়ার মত পড়ে রইলেন অয়স্কান্ত বকশী, বোধ হয় ঘুমোতেই লাগলেন তিনি অঘোরে। তার পর এক সময় অনু খুব সন্তর্পণে তাঁর মাথাটি কোল থেকে নামিয়ে রাখলেন বালিশে। রেখে নিজে নেমে এলেন খাটের ওপর থেকে। সন্তর্পণে এতটুকু শব্দ না করে আঁচলে বাঁধা চাবি দিয়ে খুলে ফেললেন একটা আলমারি। যা নেবার নিয়ে আলমারি বন্ধ করে

এগিয়ে এলেন আমার সামনে। স্তব্ধ হয়ে আমি তাকিয়ে রইলাম। একটি বারের জন্যেও চোখ তুলে তাকালেন না, একটু নীচু হয়ে নোটখানি গুঁজে দিলেন আমার হাতে। কিন্তু সেই নত মুখের টেপা ঠোঁট দুখানি কি তখন একটু নড়ে উঠেছিল! খুব আশা করেছিলাম, হয়তো একটু আওয়াজ বেরুবে সেই ঠোঁটের ফাঁকে। বৃথা আশা, কিছুই শোনা গেল না। যেমন ভাবে এসেছিলেন, তেমনি ভাবে ফিরে গিয়ে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন অয়স্কান্তর খাটে। স্থানটা একটু পালটাল। উঠে এসেছিলেন মাথার কাছ থেকে, ফিরে গিয়ে বসলেন পায়ের তলায়। ব্যাস, আর কিছুই বদলাল না।

আমার কিন্তু ধারণা হল কি যেন তিনি বলতে চেয়েছিলেন আমাকে, যা আমি ধরেও ধরতে পারলাম না।

সেই না-বলা কথাটি না শোনার আক্ষেপে আকাশে ঝড় উঠল, বিদ্যুৎ চমকাল আর আমি চাদরের কোণে টাকা কটা বেঁধে নিয়ে চাদরখানায় মাথা মুখ পেঁচিয়ে রাস্তায় নেমে পড়লাম। আমার উঠে চলে আসাটা তিনি টের পেয়েছিলেন কিনা, তাও এ পর্যন্ত আমার অজানা রয়ে গেছে।

যেমন আজও মানুষের অজানা থেকে গেছে ভূমিকম্প কখন হবে, কোথায় হবে, কি ভাবে হবে, আর সেই ভূমিকম্পের দরুন কার কতটুকু সর্বনাশ হবে। মানুষে জানে ভূমিকম্প কেন হয়, কিন্তু কখন কোন মুহূর্তে নড়ে উঠবে পায়ের তলার মাটি সে হদিশ পাওয়ার কায়দাটুকু এখনও মানুষ রপ্ত করে উঠতে পারে নি। তা যদি পারত মানুষে তা হলে আমারও সেই রাতে জানা উচিত ছিল যে পরদিন সকাল হতে না হতেই স্বয়ং অয়স্কান্ত বকশী ছুটতে ছুটতে এসে উপস্থিত হবেন আমার কাছে। এসে এমন সংবাদ আমায় শোনাবেন যা শুনে তৎক্ষণাৎ আমার পায়ের তলার মাটি দুলে উঠবে, আর আমি কোনও কিছু বিচার-বিবেচনা না করেই তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে পড়ব বকশী মশায়ের সঙ্গে।

বকশী মশাই এসেছেন কালীবাড়িতে। মানুষজন যে কজন তখন ছিল সেখানে তারা তটস্থ হয়ে উঠেছে। আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বকশী মশায় হুকুম দিলেন—"আসুন আমার সঙ্গে।"

যেমন অবস্থায় ছিলাম তেমনি অবস্থায় বেরিয়ে পড়লাম। বেশ অনেকটা এগিয়ে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি। হকচকিয়ে গিয়ে তাকিয়ে রইলাম তাঁর সেই কোটরে বসা চোখ দুটির ভেতরে। দুটো আগুনের শিখা দুই চোখ থেকে বেরিয়ে জ্বালা ধরিয়ে দিলে আমার চোখে মুখে। আতঙ্কে আমার চোখের পলক পড়ল না। অনেকক্ষণ এই ভাবে কেটে গেল মুখোমুখী দাঁড়িয়ে। তার পর একটি প্রশ্ন বেরিয়ে এল বকশী মশায়ের চোখ দুটি থেকে। হাঁ, তাঁর চোখ দুটি থেকেই

বেরিয়ে এসেছিল সেই প্রশ্নটি, মুখ তিনি নেড়েছিলেন না নাড়েননি তা আমি দেখি নি, বা কানেও কিছু শুনি নি।

কিন্তু স্পষ্ট শুনতে পেয়েছিলাম সেই প্রশ্নটি আমার বুকের মধ্যে।

"সে কোথায় ?"

উত্তর কি দিয়েছিলাম তাও আজ মনে পড়ে না। সে কে—এ প্রশ্নটিও করতে পারি নি। শুধু একভাবে তাকিয়ে ছিলাম বকশী মশায়ের চোখ দুটির ভেতরে।

কয়েকটা মুহূর্ত পরে বকশী মশাই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজেই নিজের প্রশ্নের জবাব দিলেন—"আপনি জানেন না কোথায় সে গেছে, এ আমি জানতাম। তবু একবার ছুটে এলাম আপনার কাছে।"

কথা কটি উচ্চারণ করেই তাঁর ভয়ংকর দৃষ্টি নত হল, অনেকক্ষণ একভাবে মাটির উপর তাকিয়ে রইলেন। আরও কিছু শোনবার আশায় আমিও রুদ্ধ নিঃশ্বাসে দাঁড়িয়ে রইলাম। কিন্তু আর একটি কথাও বললেন না তিনি, হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে ঘাড় হেঁট করে হাঁটতে শুরু করে দিলেন।

আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে আমিও গুটিগুটি চলতে লাগলাম তাঁর পিছনে, ঠিক সেই ভবে বকশী মশায়ের মত মাথা হেঁট করে হাঁটতে লাগলাম। আজ এতকাল পরে সেই হাঁটার কথাটা মনে পড়ায় হিসেব করে দেখছি যে সেদিন সেই যাত্রার সময় যদি একটুও আন্দাজ করতে পারতাম যে কি জটিল কি দুর্গম পথে পা বাড়াচ্ছি তা হলে হয়তো পা দুখানা স্তব্ধ হয়ে থাকত। আর এ জীবনের লাভ-লোকসানের জাবদা খাতাটায় অমন সব বিশ্রী কালো দাগগুলো পড়ত না।

॥ ছয় ॥

আসুন আমার সঙ্গে—এই হুকুমটিই বেরিয়েছিল বকশী মশায়ের মুখ থেকে। আর আসতে হবে না—এ হুকুমটি দিতে ভুলে গিয়েছিলেন। অতএব চলতেই লাগলাম। যেতে যেতে যখন তিনি থামলেন, তখন আমাকেও থামতে হল। থামলাম তাঁর অন্দরমহলের দোতলার ওপর। একখানি তালাবন্ধ ঘরের সামনে পৌঁছে তিনিও থামলেন. তাঁর হাত দু-এক পেছনে আমিও থামলাম। থেমে সামান্য একটু সামনে ঝুঁকে দরজার কড়ায় ঝোলানো তালাটির একটি মাত্র লৌহ-চক্ষুর ভ্রূকুটি কুটিল অন্ধকার দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে কি যে দেখতে লাগলেন, তা তিনিই জানেন। তাঁর ঠিক এক হাত পেছনে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম তাঁর ধনুকের মত বাঁকানো শিরদাঁড়ার ওপর নজর রেখে। বন্ধ দরজাটার ওধারে রহস্যময়ী নিয়তি তখন মুখ টিপে হাসছিল হয়তো আমাদের দশা দেখে।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল সেই ভবে। হঠাৎ বকশী মশাই সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে লম্বা একটা নিঃশ্বাস ফেললেন। ফেলে ফিরলেন আমার দিকে। সেই

মুহূর্তে তিনি সর্বপ্রথম টের পেলেন যে আমি তাঁর ঠিক পেছনেই আছি। চোখ দুটো কুঁচকে তাকিয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তার পর ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করলেন—"আপনি যে !" অকপট বিস্ময় ফুটে উঠল তাঁর গলায়।

আকাশ থেকে পড়লাম একেবারে—"বাঃ, আপনিই তো আমায় ডেকে আনলেন কালীবাড়ি থেকে।"

"ও তাই নাকি!" বকশী মশায় দম ফেলে শরীরটা ঢিলে করে দাঁড়ালেন। ডান হাতখানা তুলে মাথায় মুখে এক বার বুলিয়ে নিলেন, খসখস করে ডান গালটা একটু চুলকোলেন। তার পর মিটমিট করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞসা করলেন—"কাল সে আপনাকে কি কি বলেছিল ?"

আর এক বার আছড়ে পড়লাম আকাশ থেকে—"কই, কিছুই তো বলেন নি তিনি !"

বকশী মশাই শুরু করে দিলেন হাসি, কাঁপতে লাগল তাঁর হাড় কখানা। দু হাতে পেট টিপে ধরে খ্যাঁক খ্যাঁক খ্যাঁচ্ খ্যাঁচ্ খ্যাঁকর খ্যাঁকর বিশ্রী বিকট নেকড়ের হাসি হাসতে লাগলেন বকশী মশাই। সেই হাড়-জ্বালানো হাসির আওয়াজ এইটুকুই স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিল যে বকশী মশাই তিলমাত্র বিশ্বাস করলেন না আমার কথা। কিছুই বলেন নি তিনি আমায়, এই মহা অবিশ্বাস্য কথাটি শুনে অমন উৎকট হাসি হাসতে লাগলেন। হাসির চোটে আমার কান মাথা গরম হয়ে উঠল। এ কি রকম নোংরা সন্দেহ ! কি এমন তিনি বলতে পারেন আমাকে যা আমি লুকোতে যাব ? একটিমাত্র কথা, এতটুকু একটু শব্দও বেরোয় নি তাঁর মুখ দিয়ে, এমন কি একটি বারের জন্যে চোখ তুলে তাকান নি পর্যন্ত। তবু ঐ বিশ্রী সন্দেহ ! রাগে না অপমানে ঠিক বলতে পারব না, মাথার ভেতর ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। চোখ তুলে তাকাতেও পারলাম না বকশী মশায়ের মুখের দিকে, মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

বোধ হয় আমার সেই অসহায় অবস্থা দেখে দয়া হল ওঁর। হাসি থামিয়ে একটু সান্ত্বনা দান করবার লোভই বোধ হয় জন্মাল মনের মধ্যে। বেশ শান্ত গলায় টেনে টেনে বলতে লাগলেন—"আহা-হা, আমি না হয় শুনতে চাই না সে সব কথা; খামকা অমন লজ্জা পাচ্ছেন কেন। কি সে আপনাকে কাল শুনিয়েছিল তা জেনে আমার আর কি লাভ হবে। মোটের ওপর আর একটু কথা আপনাকে আমি জানাতে চাই, যাই সে বলে থাকুক না কেন, তার সবটুকুই আপনি বিশ্বাস করবেন না।"

বকশী মশায়কে থামাবার জন্যে হাঁ করেছিলাম। কিছুই তিনি আমাকে বলেন নি, এইটুকু বকশী মশায়কে জানাবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু কোনও ফল হল না। আমাকেই তিনি থামিয়ে দিলেন। হঠাৎ আবার ঘুরে দাঁড়ালেন দরজাটার দিকে, তালাটা ধরে হেঁচকা হেঁচকি জুড়ে দিলেন।

দাঁতে দাঁত ঘষে বলতে লাগলেন—"ভাঙ্‌বি না, ভাঙ্‌বি না শালার তালা। আচ্ছা দাঁড়া, দেখাচ্ছি মজা।" বলেই এক পা পিছিয়ে দাঁড়িয়ে দড়াম দড়াম করে লাথি মারতে লাগলেন দরজার গায়ে। আচম্বিতে বদ্ধ উন্মাদের কান্ড-কারখানা দেখে দু পা পিছিয়ে দাঁড়াতে হল আমাকে। কি যে করব, কি করে যে থামাব ওঁকে, ভেবে উঠতে পারলাম না।

কোথা থেকে আবির্ভূত হল সেই মাংসের তৈরী চলন্ত পাহাড়টা। এক হাত লম্বা একখানা লোহার রড নিয়ে এল সে। এসে কথা নেই বার্তা নেই, বকশী মশায়কে সামান্য ধাক্কা দিয়ে এক পাশে সরিয়ে ঢোকালে রডখানা দরজার কড়ার মধ্যে। খট-খটাস করে এক বার একটা চড়া আওয়াজ হল। সঙ্গে সঙ্গে রডের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে কড়া দুটো আর তালাটা চলে এল দরজার গা ছেড়ে। সেটা বকশী মশায়ের মুখের সামনে তুলে ধরে লোকটা নিঃশব্দে দাঁত বার করলে। গালের মাংসের চাপে তার চোখ দুটো গেল একেবারে ঢেকে! অর্থাৎ কত অক্লেশে সে ঐ কর্মটি সুসমাপ্ত করে ফেললে, সেটুকু বুঝিয়ে সে মনিবের কাছ থেকে সাবাস পেতে চায়।

সাবাস দেবার মত মেজাজ ছিল না তখন মনিবের, তিনি শুধু হাত নেড়ে তাকে বিদেয় হতে বললেন। তার পর দরজার সামনে গিয়ে দরজায় পিঠ দিয়ে ফিরে দাঁড়ালেন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—"আসুন, স্বচক্ষে দেখে যান সব কিছু। যা সে আপনাকে বলে গেছে তার কতটুকু সত্যি কতটুকু মিথ্যে, নিজেই যাচাই করে দেখে যান।"

আর এক বার বলতে চেষ্টা করলাম, কিছুই দেখতে চাই না আমি। কোনও কিছু জানবার বা যাচাই করবার কিছুমাত্র গরজ নেই আমার। কি সত্যি কি মিথ্যে, তা নিয়ে কেন আমি অনর্থক মাথা ঘামাতে যাব। সব সত্যির সার সত্যি এইটুকুই আমি জানি যে সেই অন্তঃসলিলা অনুর গলা থেকে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত আমি শুনতে পাই নি।

সে চেষ্টাও আমার বিফল হল। কথা শেষ করেই ঘুরে দাঁড়িয়ে দু হাতে দুটো কপাট ঠেলে দরজাটা সম্পূর্ণ খুলে ফেললেন বকশী মশাই। সঙ্গে সঙ্গে একটা অদ্ভুত আওয়াজ হল তাঁর গলার মধ্যে, যেন একেবারে আশা করতে পারেন নি এমন একটা কিছু দেখতে পেলেন। দেখে দু হাতে দরজার দু পাশের কাঠ দুটো আঁকড়ে ধরে কোনও রকমে সামলালেন নিজেকে। মাথা ঘাড় কোমর পা সমস্ত কাঠের মত সোজা শক্ত হয়ে রইল। ঘরটার মধ্যে কি দেখে অমন অবস্থা হল বকশী মশায়ের, তা জানবার জন্যে দম প্রায় বন্ধ হয়ে গেল আমার এক পা সামনে ফেলতে পারলাম না, গাছ-পাথরের মত অনড় অচল হয়ে রইলাম।

সেই ছবিখানি আমি এখনও স্পষ্ট দেখতে পাই।

চোখের পাতা টিপে বন্ধ করে একটু চেষ্টা করলেই আমার মনের চোখে আস্তে আস্তে ফুটে ওঠে একখানি পট। পটখানি আটকে রয়েছে একটি ফ্রেমে, দরজার চৌকাঠটি হল সেই ফ্রেম। ফ্যাকাশে গোছের মরা আলোর বুকে আঁকা হয়েছে রোগা লম্বা একটা অন্ধকার ছায়া। ছায়াটা মানুষেরই, পেছন দিকটা আঁকা হয়েছে শুধু। মুখ দেখা যাচ্ছে না। মূর্তিটির দুটো হাত আঁকড়ে ধরে আছে ফ্রেমের দু পাশের কাঠ দুখানা। অদ্ভুত ছবি, ইচ্ছে করলে পটুয়া ঐ ছবির নীচে লিখে দিতে পারত ছবির নাম। খুব চমৎকার মানাত নামটি, নামটি আমি ঠিক করে ফেলেছি—নিয়তি-নিরীক্ষা।

হ্যাঁ, সেদিন বকশী মশাই আচম্বিতে নিজের নিয়তিকেই দেখতে পেয়েছিলেন। তার ফলে তৎক্ষণাৎ তাঁর মনে তালা লেগে গিয়েছিল। হঠাৎ কেউ কানের কাছে মুখ নিয়ে বিশ্রী ধরনের কুক্ দি'ল যেমন তালা ধরে যায় কানে, তেমনি ধারা তালা লেগে গিয়েছিল সেদিন বকশী মশায়ের মনে। দরজার কপাট খুলতেই এমন বিদকুটে এক ধমকানি খেয়েছিলেন তিনি, যার ফলে তাঁর মন একেবারে বধির হয়ে গিয়েছিল। আমি শুনতে পাই নি কিছুই, একেবারে নিঃশব্দে দেওয়া হয়েছিল কিনা সেই ধমকানি। ঠিক জায়গাটিতেই আঘাত হানতে পেরেছিল কিন্তু সেই মারাত্মক জাতের শব্দহীন শব্দ, বকশী মশায়ের বুকের মধ্যে মোক্ষম ধাক্কা মারতে পেরেছিল, একেবারে পটে আঁকা ছবি বানিয়ে ছেড়েছিল তাঁকে।

অনেকক্ষণ পরে নড়ে উঠল সেই অন্ধকার ছায়াটি, ফ্রেমের দু পাশের কাঠ দুটো থেকে খসে পড়ল হাত দুখানা, খুব সন্তর্পণে পা ফেলে ঘরের মধ্যে এগিয়ে গেল। ফ্রেমটি ফাঁকা হয়ে গেল। একটা অশরীরী শরীর যেন মিলিয়ে গেল হাওয়ার সঙ্গে, একটা অদৃশ্য হাত যেন সামনে থেকে টেনে নিয়ে গেল সেই চামড়া ঢাকা হাড় কখানিকে। প্রাণপণে চিৎকার করে উঠলাম আমি, গলা দিয়ে আওয়াজ বেরল না। ছুটে গিয়ে পেছন থেকে আঁকড়ে ধরে ঘর থেকে টেনে বার করে আনবার জন্যে তোলপাড় করে উঠল আমার বুকের ভেতর, কিন্তু হাত-পা নাড়তে পারলাম না। কিছুই করতে পারলাম না, ফ্যালফ্যাল করে ফাঁকা ফ্রেমটির দিকে তাকিয়ে রইলাম।

হঠাৎ একটা বিকট আওয়াজ হল, ঝন ঝন করে কি যেন ভেঙে পড়ল ঘরের মধ্যে। আওয়াজটা সজোরে ধাক্কা লাগালে আমার মাথার ভেতরে। অসাড় হাত-পাগুলো সচল হয়ে উঠল। লাফিয়ে পড়লাম দরজার সামনে, দু হাতে দরজার দু পাশ ধরে নিজেকে সামলালাম। প্রাণে যতটুকু শক্তি ছিল, তার সবটুকু চোখে জড়ো করে তাকালাম ঘরের মধ্যে। আলোয় আলো হয়ে গেছে

ঘরটা। দরজার রুজু রুজু মস্ত একটা কাঁচ লাগানো জানলা, সেই জানলার কাঁচ ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। জানলার নীচে ছড়িয়ে পড়েছে কাঁচগুলো, জানলার সঙ্গে কিছু কিছু কাঁচ তখনও লেগে রয়েছে। গাঢ় সবুজ রঙের কাঁচ, কাঁচ ভাঙার ফলেই ঘরের ভেতর আলো এসে ঢুকেছে।

বকশী মশাই কই!

ঘরের ভেতর চারিদিকে নজর ফেলে খুঁজতে লাগলাম বকশী মশাইকে। আশ্চর্য কাণ্ড, বকশী মশাই উবে গেছেন একেবারে!

পার হলাম চৌকাঠ। দু পা ফেলেই থামতে হল। রাশীকৃত শিকল. এক ইঞ্চি মোটা শক্ত লোহার শিকল এক গাদা স্তূপাকার হয়ে রয়েছে ডান পাশে একখানা ছোট চৌকির ওপর। চৌকির পাশে দেওয়ালের সঙ্গে শিকলের এক মাথা লোহা দিয়ে আচ্ছা করে সাঁটা রয়েছে, আর এক মাথা চৌকির এধারে মেঝেয় পড়ে আছে। সেই মাথায় ইঞ্চিখানেক মোটা একটা লোহার বালা। হেঁট হয়ে দেখলাম, বালাটা কাটা। কোনওরকমে খানিকটা ফাঁক করা হয়েছে সেই কাটা জায়গাটা. খানিক রক্তও জমে আছে সেখানে। ব্যাপারটা বুঝতে মোটেই কষ্ট হল না। কারও হাতে বা পায়ে আটকানো ছিল ঐ লোহার বালা, কোনও রকমে বালা কেটে প্রাণপণ চেষ্টায় একটু ফাঁক করে টেনে হিঁচড়ে ছাড়ানো হয়েছে হাত বা পা বালার কবল থেকে। তারই ফল ঐ রক্ত। অর্থাৎ শিকল কেটে চিড়িয়া উড়ে গেছে।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে মাথা তুলে সোজা হয়ে দাঁড়ালাম। উড়ে গেছে যে চিড়িয়া, তাকে জানিও না চিনিও না। তবু বেশ একটা তৃপ্তি বোধ হল। লোহার শিকল আর লোহার বালাটা দেখে একটা অসহায় বন্ধ জীবের ছবি ফুটে উঠেছিল মনে, জীবটি পরিত্রাণ পেয়েছে ঐ শিকল আর বালার কবল থেকে। বেশ নিশ্চিন্ত হলাম। তখন নজর পড়ল ডান পাশের দেওয়ালে।

দেওয়ালময় কালো রেখার হিজিবিজি। কয়লা দিয়ে আঁকা হয়েছে অদ্ভুত সব ছবি, বন জঙ্গল জন্তু জানোয়ার শিকার শিকারী, এই সবই আঁকা হয়েছে। সব ছবিতেই শিকারী পড়েছে চরম বিপদে। উন্মত্তঃ চিতা ঝাঁপি'য় পড়ছে শিকারীর বুকের ওপর, হিংস্র মোষ মাথা হেঁট করে তেড়ে চলেছে শিকারীকে ফেঁড়ে ফেলতে. মস্ত বড় পাইথন পেঁচিয়েছে শিকারীর সর্ব শরীর। সব ছবির এক ভাষা এক ভাব। শিকার করতে গিয়ে শিকারী হিংস্র জানোয়ারের খপ্পরে পড়ে গেছে। শিকার করার শখ জন্মের শোধ ঘুচল বলে। ছবিগুলো দেখলে প্রাণ কেঁপে ওঠে। বীভৎস হিংস্রতা আর দুর্দান্ত প্রতিশোধস্পৃহা এই দুটিই হল ছবিগুলোর আসল বিষয়বস্তু। ছবিগুলো দেখতে দেখতে আরও খানিক এগিয়ে গেলাম সামনে।

হঠাৎ শেষ হয়ে গেল ডান পাশের দেওয়ালটা। সেইখানে ছোট দরজার

মাপের একটা ফাঁক। ফাঁকের সামনে দাঁড়িয়ে উঁকি মেরে দেখলাম। একখানি ছোট্ট ঘর, ঘরের মটকায় আলো আসার জন্যে কাঁচ লাগানো হয়েছে, কিন্তু কোনও দেওয়ালে একটি জানালা নেই। ঘরের মধ্যে খসখস করে নড়ছে কিছু বলে মনে হল। ভাল করে নজর করতে দেখতে পেলাম, কে যেন হামাগুড়ি দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যে হামাগুড়ি দিচ্ছে তাকে চিনতে একটু দেরি হল। হামাগুড়ি দিচ্ছেন বকশী মশাই, মেঝের ওপর নাক ঘষড়ে কি খুঁজছেন।

ঘরের ভেতরের আবছা অন্ধকারটা সয়ে এল চোখে, স্পষ্ট তখন দেখতে পাচ্ছি ঘরের সাজ-সরঞ্জাম। ঘরখানিকে ঠাকুরঘর বলেই মনে হল। সামনের দেওয়ালের কোলে চুড়োওয়ালা একখানি কাঠের আসন, যেমন আসনে বিগ্রহ থাকে। সেই আসনের সামনে পুজোর থালা বাসন কোষাকুষি প্রদীপ ধূপদান, এমনি সব জিনিসপত্র সাজানো রয়েছে। কিন্তু বিগ্রহ কোথায়! বিগ্রহের আসন যে খালি! পা টিপে টিপে আরও একটু এগোতে দেখতে পেলাম বিগ্রহটিকে। আসনের ওপরে নেই সেটি আসনের সামনে উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে।

সারা ঘরখানা নাক ঘষড়ে বকশী মশাই গিয়ে পৌঁছলেন আসনের সামনে। উপুড় হয়ে পড়া বিগ্রহটির পাশে গিয়ে তাঁর নাক থামল। সোজা হয়ে উঠে বসে মূর্তিটিকে দু হাতে তুলে সামনে ফিরিয়ে দেখতে লাগলেন।

কয়েক হাত পেছনে দাঁড়িয়ে আমিও দেখলাম। বেঁকেচুরে বাঁশী মুখে দাঁড়িয়ে আছেন কেষ্ট ঠাকুর, যেমন তাঁর দাঁড়িয়ে থাকা অভ্যাস। বাঁ দিকে সামান্য একটু হেলে পড়েছেন। বাঁ দিকটা কিন্তু খালি, হেলে পড়েছিলেন যাঁর গায়ের ওপর, তিনি অন্তর্ধান করেছেন। করেছেন যে তারও প্রমাণ দেখতে পেলাম। ঠাকুর দাঁড়িয়ে আছেন বাঁ পায়ের ওপর, ডান পাটি নিয়ম মাফিক বাঁ পায়ের গোছের ওপর দিয়ে বাঁ দিকে এসে পড়েছে। চরণের তলায় একখানি লম্বা পাথরের ওপর খোদাই করা রয়েছে পাশাপাশি দুটি পদ্ম। ডান ধারের পদ্মটির ওপর ঠাকুর দাঁড়িয়ে আছেন, বাঁ ধারের পদ্মটির ওপর রয়েছে ছোট দুখানি সাদা পাথরের চরণ। চরণের ওপর থেকে আর কিচ্ছু নেই। রাই তাঁর চরণ দুখানি ঠাকুরের হেপাজতে রেখে চরণ ছাড়াই উধাও হয়েছেন।

অনেকক্ষণ ধরে বকশী মশাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন বিগ্রহটিকে। তার পর খুব সন্তর্পণে সেটিকে হেলান দিয়ে রাখলেন আসনের গায়ে। রেখে মাথা হেঁট করে স্থির হয়ে বসে রইলেন।

ব্যাস, চুকে গেল সব। সত্যিই তখন আমার মনে হল এতক্ষণে ভয়ঙ্কর একটা কাণ্ডের পরিণতি পরম পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছল। আমি আর বকশী মশাই একখানা ডিঙি নৌকোয় চেপে নাচছিলাম যেন এতক্ষণ প্রচণ্ড তুফানের ওপর। হঠাৎ তুফানটা গেল থেমে, ঝপ করে ঢেউগুলো ঠাণ্ডা হয়ে গেল, ডিঙিখানা

একেবারে স্থির হয়ে ভাসতে লাগল। দম ফেলে বাঁচলাম আমরা, এতক্ষণ ডিঙির কিনারা আঁকড়ে ধরে দম বন্ধ করে আছাড় খাচ্ছিলাম ঢেউয়ের মাথায়. এবার হাতের মুঠি আলগা হল। সর্ব শরীর শিথিল হয়ে গেল। মন-মেজাজও এলিয়ে গেল কেমন। যা হবার তা হয়েই গেছে, নাকানি-চোবানি খাওয়া যেটুকু কপালে ছিল, তা খাওয়া শেষ। সুতরাং আর চিন্তা কি। এবার ডিঙিখানা কূলে ভিড়িয়ে মাটির ওপর পা দিতে পারলেই হয়।

হায় রে, তখনও যদি বুঝতে পারতাম যে, শক্ত মাটির ওপর পা দিয়ে দাঁড়াতে পারার আশায় যেখানে নিয়ে ভেড়াব আমরা ডিঙি, সেখানে পায়ের তলায় চোরাবালি ছাড়া আর কিছুই মিলবে না, তা হলে অতটা পরিমাণ স্বস্তির নিঃশ্বাস খামকা খরচা করে বসতাম না।

অনেকক্ষণ পরে বকশী মশাই মুখ তুলে ফিসফিস করে কাকে যেন বলতে লাগলেন অনেক কথা। সব কথাগুলো আমার মনে নেই। কয়েকটা কথা এখনও যেন শুনতে পাই মনের মধ্যে। বকশী মশাই খুব চুপিচুপি খুবই অসহায়ভাবে বলতে লাগলেন, "চলে গেলে! তুমিও আমায় ছেড়ে চলে গেলে! তুমিও বেইমানি করলে আমার সঙ্গে? এর পর কি হবে আমার? কি করব আমি এর পর এইভাবে বেঁচে থেকে? তা আমায় শিখিয়ে দিয়ে গেলে না কেন!"

॥ সাত ॥

তুমি।

সেই চিরন্তনী তুমি, চিররহস্যময়ী তুমি, চিরায়ুষ্মতী তুমি। যার জন্যে চিরাচরিত হা-হুতাশ চলে, চলছে, চলবেও চিরকাল। চিরপ্রহেলিকা, চির-পলাতকা, চিরবাঞ্ছিতা সেই—তুমি। যে শুধু ছলনাময়ী ছায়া, ধরা-ছোঁয়ার নাগালের বাইরে। যে স্বপ্ন দেখায়, কিন্তু স্বপ্ন বোঝায় না। মানে বলে দেয় না স্বপ্নের। তাই সেই স্বপ্ন যখন ভেঙে যায় তখন ভেবে পায় না কেউ, তার পর কি নিয়ে বেঁচে থাকা যায়।

বেঁচে থাকা যায় তখন একটি মাত্র জিনিস সম্বল করে। জিনিসটির নাম —ভয়। মরণের ভয়কে আঁকড়ে ধরে তখন বেঁচে থাকতে হয়। নিজেকে নিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হয় তখন, ছুটে বেড়াতে হয় দুনিয়ার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। পেছনে তাড়া করে ছোটে মরণ, সেই মরণকে ফাঁকি দেবার জন্যে তখন লুকোচুরির খেলা শুরু হয়। সেই খেলার নেশায় মাতাল হয়ে বেঁচে থাকা যায় তার পর। সে খেলা নিজের গরজেই শেখে মানুষে, কাউকে শিখিয়ে দিতে হয় না।

বকশী মশায়কেও শেখাতে হল না।

কোলের ওপর হাত দুখানা লম্বা করে ফেলে রেখে ঘাড় হেঁট করে থুতনিটা বুকের সঙ্গে ঠেকিয়ে বসে রইলেন এক ভাবে একটা মরা গাছের শুকনো ডালের মত। অনেকক্ষণ পরে টান টান হয়ে উঠল তার শিরদাড়া ঘাড় পিঠ, মুখখানা ওপর দিকে তুলে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন ঘরের মটকার কোণে। তার পর এক ঝটকায় নিজেকে খাড়া করলেন। নজর এক চুল নড়ল না ঘরের মটকা থেকে। সেই অবস্থায় পিছোতে লাগলেন, কয়েক পা পিছিয়েই এসে পড়লেন আমার গায়ের ওপর। চমকে উঠলেন ভয়ানক রকম, মাত্র এক পলক তাকালেন আমার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে একটা চাপা গর্জন শোনা গেল —"পালান"। নিজে কিন্তু একটুও তাড়াহুড়ো করলেন না। সেই এক ভাবে মটকার দিকে নজর রেখে পিছোতে লাগলেন আমাকে ঠেলে। তখন তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে আমার নজরও গিয়ে পেঁাছল ঠিক জায়গায়। ব্যাস—একেবারে নড়নচড়ন-শক্তি রহিত হয়ে গেল আমার। আমিও জ্ঞানহারা হয়ে তাকিয়ে রইলাম মটকার দিকে, আর বকশী মশায়ের ঠেলার চোটে পিছোতে লাগলাম।

জ্বলজ্যান্ত মরণ, কুচকুচে কালো হাত তিন-চার করে লম্বা দুগাছা দড়ি এঁকে বেঁকে এগিয়ে আসছে। কাঠের ফ্রেমে টুকরো টুকরো কাঁচ লাগানো হয়েছে ঘরের মটকায়, সেই ফ্রেম থাকার দরুনই সুবিধে হচ্ছে ওদের এগিয়ে আসার, একটা ফ্রেম থেকে আর একটা ফ্রেম মাথা উঁচু করে নাগাল পাচ্ছে। শুধু কাঁচ থাকলে বোধ হয় পারত না ওভাবে এগোতে, আছড়ে পড়ত।

তখনও যেটুকু হুঁশ ছিল তাতে এইটুকু মাত্র বুঝেছিলাম যে, ওদের আগেই আমাদের পেঁাছতে হবে দরজার কাছে। দরজার মাথায় গিয়ে যদি ওরা দু জন দাঁড়াতে পারে, তা হলে অবস্থাটা কি দাঁড়াবে, তা আন্দাজ করতে পেরেছিলাম। পারলে কি হবে, এক ছুটে যে পালাব ঘর ছেড়ে, সে হিম্মতও হারিয়ে ফেলেছি। কেন, কিসের জন্যে পালাতে পারি নি এক ছুটে, তা বুঝিয়ে বলতে পারব না। নিজেই এখনও বুঝতে পারি নি কি হয়েছিল তখন। মাথার ওপর মটকায় দু-দুটো কালকেউটের দু জোড়া ছোট ছোট পুঁতির মত চোখ জ্বলছিল। ঠিক দেখেছিলাম সেই চোখ চারটের রঙ্, ঠিক বলতে পারি আগুনের ফিনকির মত রক্তের ছাট ছিল সেই চোখ চারটেয়। নিদারুণ প্রতিহিংসার আগুন জ্বলছে সেই ছোট পুঁতিগুলোর ভেতরে। সেই আগুনের আঁচেই বোধ হয় বুকের ভেতরটা হিম হয়ে গিয়েছিল। কিছুতেই নজর সরাতে পারছিলাম না তাদের চোখের ওপর থেকে, নজর সরালেই যদি লাফিয়ে পড়ে।

আচম্বিতে উৎকট আওয়াজ উঠল। উক্ উক্ উক্ উক্—একেবারে ফেটে যাবার যোগাড় হল কান। সঙ্গে সঙ্গে সজোরে একটা ধাক্কা মারলেন আমায়

বকশী মশাই, ছিটকে গিয়ে পড়লাম জানলার সামনে ভাঙা কাঁচগুলোর ওপর। উঠে দাঁড়াবার আগেই দেখতে পেলাম, উল্লুকের বাচ্চা দুটো ঠাকুরঘরে ঢুকে নৃত্য জুড়ে দিয়েছে। মটকার নাগাল পাবার জন্যে প্রাণপণে লাফিয়ে উঠছে দেওয়ালের গায়ে, আবার আছড়ে পড়ছে নীচে। মটকায় তারা দু জন যে কি করছে দেখতে পেলাম না, দেখবার সুযোগও পেলাম না। বকশী মশাই বজ্র-মুষ্টিতে ধরে ফেললেন আমার কব্জি একটা, তার পর এক হেঁচকায় একেবারে বার করে আনলেন দরজার বাইরে। সঙ্গে সঙ্গে প্রাণপণে ডাকতে লাগলেন—"আয়—পালিয়ে আয়। ওরে পালিয়ে আয় তোরা। ওরে বালি, ওরে তারা—"

কে কার ডাক শোনে, প্রলয়ংকর আওয়াজ হচ্ছে তখন ঘরের মধ্যে। উক্ উক্ হুপ্ হাপ্ দুপ্ দাপ্, তার সঙ্গে হিস হিস সাপের গর্জন। বাইরে বকশী মশাইও বুক ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছেন—"ওরে বালি ওরে তারা—" ইতিমধ্যে কখন যে চাকরবাকররা এসে দাঁড়িয়েছে আমাদের পেছনে, তা টের পাই নি। অবোধ্য ভাষায় তারাও চেঁচাতে লাগল। বকশী মশাই ঘুরে দাঁড়িয়ে তাদের বুঝিয়ে দিলেন ব্যাপারটা। সঙ্গে সঙ্গে দু জন ছুটে নেমে গেল নীচে, তৎক্ষণাৎ ফিরে এল দুখানা লোহার রড আর দুটো টাঙ্গি নিয়ে। চার জনে চারটে অস্ত্র হাতে নিয়ে এক সঙ্গে ঢুকল ঘরের মধ্যে। ততক্ষণে ঘরের ভেতরের শোরগোল ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে।

দম বন্ধ করে তাকিয়ে রইলাম। রড আর টাঙ্গি বাগিয়ে ধরে সন্তর্পণে ওরা চার জন ডান পাশে ঘুরে অদৃশ্য হল। একটু পরে বেরিয়ে এল সকলেই। দু জনের হাতের ওপর কালো প্রাণী দুটো ঢুলছে।

আস্তে আস্তে সাবধানে নামিয়ে দিল তাদের বকশী মশায়ের পায়ের কাছে। বসতে পারল না তারা, ঢুলে পড়ল। তখন দেখতে পেলাম, দু জনেরই ডান হাত দু খানায় কালো সাপ দুটো পেঁচিয়ে রয়েছে। সাপ দুটোর ঠিক মাথার নীচেই মোক্ষম ভাবে আটকে বসেছে বালি তারার দুই মুঠো। মুঠোর বাইরে সাপ দুটোর মুখের যেটুকু বেরিয়ে আছে, সেটুকু থেকে রক্ত ঝরছে। থেবড়ে থেতলে শেষ হয়ে গেছে সাপেদের মুখ।

বসে পড়লেন বকশী মশাই। আর্তনাদ করে উঠলেন—"ওরে বালি রে, ওরে তারা।" একটা সাপের লেজ ধরে টানাটানি জুড়ে দিলেন এক জনের হাত থেকে ছাড়াবার জন্যে। তৎক্ষণাৎ দুটো চাকর বসে পড়ে বালি তারার হাতে পেঁচানো সাপ দুটোকে টেনে খুলে ফেললে। কিছুতেই কিন্তু ওদের মুঠো আলগা হল না, সাপের মাথা আটকেই রইল ওদের মুঠোর মধ্যে। এক দৃষ্টে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল তারা বকশী মশায়ের মুখের দিকে। বকশী মশাই প্রচণ্ড জোরে নিজের কপাল চাপড়াতে লাগলেন।

বালি তারা নিমকের দাম গুণে দিয়ে বিদেয় নিলে। ওদের গলায় সোনার চেন সোনার বকলস পরানো সার্থক হল। বকশীবাড়ির পেছনের বাগানে মাটির তলায় তারা শান্তিতে ঘুমিয়ে রইল।

সব কাজ চুকতে খুব বেশী সময় লাগল না। বকশী মশায় খুবই শান্ত হয়ে পড়লেন। অস্বাভাবিক রকম মিইয়ে পড়লেন যেন। বালি তারার সমাধি দিয়ে বাগান থেকে ফিরে আর ঘরে ঢুকলেন না। তাঁর সেই হাড় চামড়া দিয়ে সাজানো বৈঠকখানার বারান্দায় পায়চারি আরম্ভ করলেন।

আগাগোড়া সবটুকু সময়ই আমি ছিলাম বকশী মশায়ের পাশে পাশে। কোনও কাজেই আমার হাত দেবার প্রয়োজন হয় নি। তবু ছিলাম। থাকবার জন্যে কেউ অনুরোধও করে নি আমাকে। যখন ইচ্ছে চলে যেতে পারতাম। কেন যে সে ইচ্ছেটার উদয় হয় নি চিত্তে, তা বলতে পারব না। আজ এত দিন পরে, একটা জবাব খাড়া করেছি মনে মনে। নিজেকে নিজে বোঝাই, সে দিন বকশী মশাই আর তাঁর মরা উল্লুক দুটোকে ছেড়ে চলে না আসবার কারণ আর যাই হোক না কেন, মজা দেখার প্রবৃত্তি নয় নিশ্চয়ই। কিংবা ওপরের ঘরে যে শিকলগুলো দেখেছিলাম, বা তার পরে যা যা ঘটে গেল, সে সমস্ত ব্যাপারের অন্তর্নিহিত রহস্যের মর্মভেদ করার উৎকট বাসনাও মনের কোণে উদয় হয় নি তখন। এমনই ছিলাম, কোনও বাসনা কামনা না নিয়েই ছিলাম সারাটা সময় বকশী মশায়ের পাশে পাশে। উল্লুক দুটোর পঞ্চত্বপ্রাপ্তিতে শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলাম, এই জাতের হালকা রসিকতা নিজেই নিজের সঙ্গে করতে লজ্জা পাব। বরং সত্যি কথা বলতে গেলে বলতে হয়, পঞ্চত্বলাভ করার জন্যে সেই মোক্ষম সময়ে উল্লুক দুটোর আবির্ভাব যদি না ঘটত সেই যমেদের সামনে, তা হলে পঞ্চত্বলাভ করে নিজেই নিজের জন্যে শোকে আকুল হয়ে পড়তাম। আসল কথা হচ্ছে, শোক দুঃখ আনন্দ উল্লাস ইত্যাদি ভাবগুলোর একটাও উদয় হয় নি তখন চিত্তে, স্রেফ খানিকটা অসাড় হয়ে পড়েছিলাম। যাকে সাদা কথায় বলা চলে—অনুভূতি-রহিত—তাই ঘটে গিয়েছিল কিছুটা সময়। উৎকট তপস্যা করে সাধু গুরু সজ্জনে ঐ অবস্থাটা লাভ করার চেষ্টা করেন বলে শুনেছি। আমার কিন্তু বিনা চেষ্টাতেই সেটা লাভ হয়ে গিয়েছিল কিছুটা সময়ের জন্যে। কিছুটা সময় নিঃসঙ্গ নিরবলম্ব অবস্থায় নিরুপদ্রবে কাটিয়েছিলাম, এইটুকুই শুধু বলতে পারি।

ও রকম দুর্লভ মুহূর্ত খুব বেশী আসে না মানুষের জীবনে। নিজেকে নিজে এতখানি একা বলে মনে করতে লাগলাম যে শেষ পর্যন্ত নিজেও যে রয়েছি নিজের সঙ্গে, এটুকু জ্ঞানও রইল না, এ জাতের অনস্তিত্ব-বোধ সহজে আসে না। যদি বলি, এই অবস্থাটার নামই সত্যিকারের ঘুমন্ত অবস্থা, তা

হলে কি অন্যায় বলা হবে। মন ঘুমিয়ে পড়েছে, বুদ্ধি ঘুমিয়ে পড়েছে, জ্ঞানও ঘুমিয়ে পড়েছে, এই জাতের একটা অবস্থাটার কথা যদি কল্পনায় আনা যায় তা হলে হয়তো আমার সেদিনের অবস্থার ধারণা করা সম্ভব হবে। সত্যিই আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বকশী মশায়ের পাশে পাশে ঘুরে বেরিয়েছিলাম সেদিন। আবার একথাও বলা চলে, অরুস্কান্ত বকশীও তখন ছিলেন না আমার মনে জ্ঞানে কোথাও। বকশী মশায়ের চামড়া ঢাকা হাড়গুলোও উবে গিয়েছিল। ছিল যা, তা হল একটা ছায়া। চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য একটা ছায়ামূর্তির পাশে পাশে ঘুরে বেরিয়েছিলাম ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে। হয়তো সে ছায়াটা আমার নিজেরই, হয়তো সেদিন নিজেকে নিজে সত্যিই দেখতে পেয়েছিলাম, চিনতে পেরেছিলাম, নিজের আসল রূপটা চিনতে পেরেই অমন ভাবে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছিলাম। আমি শুধু একা—এ কথাটি নিয়ে কাব্য করা যায়, মন মাতানো গানও জোড়া যায়, কিন্তু সত্যিকারের একা হয়ে পড়াটা যে কি সাংঘাতিক অবস্থা, সেদিন সেটা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিলাম।

অবশেষে বকশী মশায় যখন তাঁর বৈঠকখানার বারান্দায় উঠে পায়চারি শুরু করলেন তখন নিজেকে নিজে ফিরে পেলাম। তার একটা কারণ এই হতে পারে যে দু জনের পাশাপাশি পায়চারি করার ঠাঁই ছিল না সে বারান্দায়। বারান্দার নীচে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম তাঁর দিকে। তার পর বললাম —"এবার আমি যাই।"

বকশী মশায় শুনতে পেলেন কি না বুঝতে পারলাম না, পায়চারি তাঁর থামল না। আরও একটু সময় দাঁড়িয়ে রইলাম চুপ করে, তার পর পিছন ফিরলাম। এক পা কি দু পা ফেলেছি, কানে গেল—"কোথায় চললেন?"

ফিরে দাঁড়ালাম, বকশী মশাই সমানে পায়চারি করছেন। সন্দেহ হল—ভুল শুনি নি তো?

আবার পিছন ফিরে পা বাড়ালাম।

সঙ্গে সঙ্গে আবার কানে গেল—"যাচ্ছেন যে, তার খোঁজ করবেন না?"

টপ করে ফিরে দাঁড়ালাম, টপ করে মুখ থেকে বেরিয়ে গেল—"কার! কাকে খুঁজে বার করতে হবে?"

বকশী মশায়ও দাঁড়িয়েছেন তখন। সোজা চেয়ে আছেন আমার চোখের পানে। আস্তে আস্তে টিপে টিপে খুব সাবধানে প্রতিটি কথা ওজন করে বলতে লাগলেন—"কোথায় যাবেন? কেন যাবেন? কি গরজ পড়েছে আপনার যাবার? কোথায় কার কি এমন ক্ষতি হবে আপনি না গেলে? কোথায় কে হা-পিত্যেশ করে পা ছড়িয়ে বসে কাঁদছে আপনি যাবেন বলে?"

এক সঙ্গে এতগুলো প্রশ্ন করে হাঁপিয়ে পড়লেন বকশী মশাই। কোটরে বসা চোখ দুটি তাঁর ধিকিধিকি জ্বলতে লাগল।

একটা প্রশ্নেরও জবাব দিতে পারলাম না আমি। এক পা এক পা করে এগিয়ে গিয়ে বারান্দার কিনারায় বসে পড়লাম।

কয়েকটা মিনিট পেছনে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন বকশী মশাই। তার পর খুব চাপা গলায় বললেন—"যাব, আমিও যাব—আজ হোক, কাল হোক, দু জনে বেরিয়ে পড়ব। তাদের খুঁজে বার করব। তার পর আপনি আপনার সব প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাবেন।"

খুবই ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলাম। কি প্রশ্ন, কিসের জবাব, কিছুই ভেবে উঠতে পারলাম না।

॥ আট ॥

আমাদের যেতে হবে।

কোথায় যেতে হবে, কেন যেতে হবে, সে প্রশ্ন একেবারে অবান্তর। যেতে হবে যখন, তখন যেতেই হবে। আমাদের রওনা হবার ক্ষণটি ধীরে সুস্থে এগিয়ে আসতে লাগল।

আস্তে আস্তে বকশী মশায়ের রূপ পালটাতে লাগল। খাটো কাপড় খাটো ফতুয়া পরা হাড্ডিসার যে মানুষটির খুব কাছাকাছি আমি পৌঁছেছিলাম অতি অল্প সময়ের মধ্যে, সে মানুষটিকে আর কিছুতে খুঁজে পাবার উপায় রইল না। এ বি সি অর্থাৎ অয়স্কান্ত বকশী কোম্পানির মালিক কেতাদুরস্ত সাজ-পোশাক, খানদানী আদবকায়দা আর সূক্ষ্ম ওজনের কথাবার্তা নিয়ে রাশি রাশি মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে লাগলেন, প্রচুর দলিল দস্তাবেজ সই করলেন, নানা রকমের ব্যবস্থা বন্দোবস্ত করতে ব্যস্ত রইলেন দিনের মধ্যে কুড়ি ঘণ্টা করে। অনেক নতুন খবর জানতে পারলাম। জানলাম, চট্টগ্রামে কলকাতায় রেঙ্গুনে মাদ্রাজে সব বড় বড় শহরে বড় বড় অফিস আছে অয়স্কান্ত বকশীর। এন্তার বড়সাহেব ছোটসাহেব বড়বাবু ছোটবাবু দরোয়ান চাপরাসী কাজ করে সেই সব অফিসে। তাদের মধ্যে শতকরা দু জনেরও সৌভাগ্য হয়নি তাদের খোদ মালিককে দেখবার। এইটুকু শুধু জানে সকলে, মালিক সমুদ্রের কিনারায় ঘর বেঁধে থাকেন, নিজের স্টীমারে চড়ে সমুদ্রে ঘুরে বেড়ান, সমুদ্রের সঙ্গে ঘর না করলে তিনি তাঁর শরীরের মধ্যে বেশীদিন টিকতে পারবেন না।

অয়স্কান্ত বকশী বেরোচ্ছেন জানতে পেরে কক্সবাজারের মানুষে বেশ চমকে উঠল। তার পর যখন শুনল যে বকশী মশাই তীর্থ করতে বেরোচ্ছেন, তখন একেবারে ধাত ছাড়বার মত অবস্থা হল সকলের। শেষ পর্যন্ত দুম করে ধর্মে মতি হল বকশী মশায়ের, ব্যবসাপত্র ঘরদরজা ধন-দৌলতের বিলিব্যবস্থা করে কোথাকার কে একটা হাভাতে বাউন্ডুলের সঙ্গে কক্সবাজার ছেড়ে চলে

যাচ্ছেন, কবে যে আবার ফিরে আসবেন তারও ঠিকঠিকানা নেই, কত দিনের জন্যে কোথায় যাচ্ছেন তাও বলে যাচেছন না, এই সমস্ত ভেতরের খবর যখন প্রকাশ হয়ে পড়ল চারিদিকে, তখন ছুটল মানুষ অয়স্কান্তর আকর্ষণে। বকশী মশায়ের নাম করতে যারা থুতু ফেলত মাটিতে, তারাও না গিয়ে পারল না একবার তাঁর কাছে। কখনও সাহস হয় নি যাদের বকশী মশায়ের ছায়া মাড়াতে, তারাও গেল। প্রত্যেকের সঙ্গে দেখা করলেন বকশী মশাই। প্রত্যেককে একান্ত সঙ্গোপনে জিজ্ঞাসা করলেন, সামান্য কোনও উপকার হওয়া তাঁর দ্বারা সম্ভব কি না। এক প্রাণীকেও বিমুখ করলেন না। বকশী মশায়ের নিন্দে না করে, তাঁকে গালমন্দ না দিয়ে যাঁরা জল গিলতে পারতেন না, তাঁরা দ্বিগুণ উৎসাহে লোকটার চালবাজির কেচ্ছা কীর্তন করে বেড়াতে লাগলেন, তাঁর কাছ থেকে সকলের অগোচরে যা আদায় করবার তা আদায় করে নিয়ে। আর যাঁরা কোনও কিছু চাইলেনও না, নিলেনও না বকশী মশায়ের কাছ থেকে, তাঁরা পড়লেন আমায় নিয়ে। যে মানুষ বকশী মশায়ের মত জীবকে কেঁচো বানিয়ে ঘরছাড়া করে সঙ্গে নিয়ে চলল, সে মানুষ যে কি দরের চিজ,—তা তাঁরা এক আঁচড়েই বুঝে ফেললেন। ফেলে মোক্ষম জাতের সব আধ্যাত্মিক আম্বা নিয়ে ঘিরে ধরলেন আমায়। তাবিজ কবচ মাদুলি, নিদেনপক্ষে একটু কৃপা আদায়ের জন্যে ছিনে জোঁকের মত ছেঁকে ধরলেন সকলে। ভগবান সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল এক বাবামণি বনে যাবার বাঘা সুযোগ পেয়ে গেলাম। কিন্তু বাগিয়ে বাণীদান শুরু করবার আগেই স্টীমার এসে গেল। বকশী মশাই তৈরী হয়েই ছিলেন, দুটো দিন আর সবুর করলেন না, তাঁর সঙ্গে স্টীমারে চড়তে হল।

খুব বেশী সাফসাফাই মন নিয়ে জাহাজঘাটে উপস্থিত হই নি সেদিন। নতুন জায়গায় গিয়ে নতুনত্বের টক মিষ্টি ঝাল রস চাখবার সুযোগ পাওয়ার জন্যে নোলাটা ঠিক তেমন ভাবে সকসক করে ওঠে নি। সামনের টানে সামনে এগিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু সেই যাত্রায় সামনের সবটুকুই ছিল নিরেট অন্ধকারের গর্ভে, এমন কি কল্পনার কুটিল কারচুপিরও নাগালের বাইরে। যাচ্ছি, কারণ যেতেই তো হবে একটা কোথাও। না গিয়ে করব কি? চিরকালটা কাটাব নাকি কক্সবাজারে! এই ধরনের সব উলটো-পালটা মনগড়া জবাব দিয়ে কোনও রকমে মনকে বুঝিয়ে নিয়েছিলাম। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কিন্তু ভেতর থেকে কে যেন বার বার বলছিল—কি এমন দায় পড়েছে তোমার ঐ আধপাগলা বড় লোকটার পিছু পিছু ছোটবার! ঐ তো রইলেন বসে ব্রহ্মচারী সনাতন শর্মা গ্যাঁট হয়ে। যবে যখন সুবিধে সুযোগ নিজে এসে পৌঁছবে ওঁর সামনে আবার সেই আদিনাথে ফিরে যাবার, তখন উনি উঠবেন। কক্সবাজারটা কি দুনিয়ার বাইরে নাকি যে এখানে শান্তিতে দু-দশ মাস বসে থাকা যায় না।

ব্রহ্মচারীজী বললেন কিন্তু অন্য কথা। সনাতন ভারতের চৈতন্যময় সত্তা

ছাড়া অন্য কিছু যিনি কিছুতে বুঝতে চাইতেন না, তিনি একেবারে ষোল আনা জড়বাদীর মত ব্যাকুল হয়ে উঠলেন অমঙ্গলের আশঙ্কায়। চুপি চুপি বললেন—"কাজ কি থামকা পরের ঝামেলায় জড়িয়ে পড়বার? মনে করো না যেন, একখানা ঠ্যাং আমার নেই বলে তোমায় আমি ধরে রাখতে চাচ্ছি। তুমি বরং সামনের স্টীমারে একলাই চাটগাঁয়ে ফিরে যাও, আমি পরে একলা যাব। কিন্তু ঐ বিশ্রী লোকটার সঙ্গে যেও না ভাই, কোথা থেকে কি ফ্যাসাদ বাধবে তা কি কেউ বলতে পারে। তা ছাড়া অতি সামান্যই আমাদের প্রয়োজন, দিনান্তে দুখানা রুটি আর একটু নুন। তার জন্যে পরের খিদমত খাটতে যাই কেন?" ব্রহ্মচারীজীর কথাগুলো বুকে বেঁধবার মত খাঁটী কথা। কাজেই জবাব না দিয়ে মুখ বুজে থাকতে হল।

জাহাজঘাটে বহু বিশিষ্ট অ-বিশিষ্ট ব্যক্তি এলেন বকশী মশাইকে বিদেয় দিতে। দুধের মত সাদা কাপড়ের তৈরী পায়ের সঙ্গে সাঁটা চোস্ত্ পাজামা, চকচকে কালো সিল্কের চাপকান, মাথায় ততোধিক কালো পারসী টুপি পরে অয়স্কান্ত বকশী অনেকের হাত থেকে ফুলের গোছা নিলেন, অনেকগুলো মালা গলায় পরলেন আর খুললেন। খুব কায়দা-মাফিক এক ছিটে হাসি মুখে মেখে বারবার দু হাত কপালে ঠেকাতে ঠেকাতে জাহাজে উঠে এলেন। তার পর জাহাজখানা একটু একটু করে পিছোতে লাগল। বকশী মশাই রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন সেই রকম হাসি হাসি মুখে। ডাঙায় অনেকগুলো রুমাল, অনেকগুলো হাত নড়তে লাগল। এক কোণে দাঁড়িয়ে আমিও তাকিয়ে রইলাম তীরের দিকে। মনে হল যেন, অবশ্য ভুলও হতে পারে, চোখের ভুল মনের ভুল বা বুদ্ধির ভুল, যে কোনও একটা কিছুর ভুল হতে কতক্ষণ লাগে মানুষের। কিন্তু ঠিকই মনে হল যেন, অনেকটা দূরে একটা লম্বা টিনের গুদামের কোণে আবছা একটা মূর্তি আমি দেখতে পেলাম। আপাদমস্তক সাদা কাপড়ে ঢাকা এক জন ঠিকই দাঁড়িয়েছিল আধ-অন্ধকারের মাঝে গুদামের পিচ মাখানো টিনের দেওয়ালের সঙ্গে মিশে। যেন একখানি ছবি, নিকষ কালো পটভূমিকার ওপর শাঁখের মত সাদা রঙ্ দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল সেই ছবিখানি। অত দূরে থেকেও সাদা কাপড়ে ঢাকা আস্ত অবয়বটা চমৎকার বোঝা যাচ্ছিল, বোঝা যাচ্ছিল কপাল নাক মুখ চোখ সব কিছু। মুখখানি ছিল খোলা, হ্যাঁ, অত দূরে থেকেও স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলাম আমি মুখখানি, ঠিকই দেখেছিলাম। কিন্তু সেই দেখাটা আমার মনের ভুল বা চোখের ভুল বা বুদ্ধির ভুলও হতে পারে। হোক ভুল, সেই ভুলটুকু যেন আমার জীবনে অক্ষয় হয়ে থাকে।

বড় লোকের বড় কাণ্ড।

জাহাজখানি কিন্তু এমন কিছু বড় ব্যাপার নয়। মাল বয় না, যাত্রী বয় না, অয়স্কান্ত বকশী মশাইকে ছাড়া অন্য কিছু বয় না। কিন্তু নেই কি জাহাজে! খাবার ঘর আছে, শোবার ঘর আছে, বসবার ঘর আছে, খেলাধুলো করবার ঘর আছে, এমন কি নাচবারও ঘর আছে। সামনে পেছনে দুটি মাস্তুল, মাঝখানে এক চোঙ, সামনে পেছনে ডেক্, সব আছে। জাহাজ-ভরতি লোক, কাপ্তেন সাহেব হলেন গোয়ানজী, আর বাকী সকলে নোয়াখালি চট্টগ্রামের মুসলমান। ঝক্‌ঝক্ তক্‌তক্ করছে জাহাজখানি, কোথাও এক ফোঁটা ময়লা নেই। মালিকের থাকবার কেবিন ছাড়া আরও কয়েকটা কেবিন আছে। মালিক যদি কখনও তাঁর বন্ধুবান্ধব কাউকে নিমন্ত্রণ করেন তো তাঁরা থাকবেন। কাপ্তেন সাহেবের সঙ্গে আলাপ হল। বললেন—"বারো বছর আগে এ বি সি কোম্পানি কিনেছে এই জাহাজ সিঙ্গাপুরের এক বড়লোক ব্যবসাদারের কাছ থেকে। বারো বছরে বড় জোর বার তিনেক মালিক ঘুরেছেন এই জাহাজে। প্রায়ই উনি ওঁর বড়লোক বন্ধুদের জাহাজ দিয়ে দেন বেড়াবার জন্যে। এই তো গত ছ মাস ছিল রেঙ্গুনে এক বর্মী কাঠওয়ালার কাছে। তাঁর স্ত্রীর খুবই শরীর খারাপ, শ্বাস নিতে কষ্ট হয়, তাই তিনি এই জাহাজে বাস করতেন। তাঁকে নিয়ে সমুদ্রে ঘুরে বেড়াতে হত। মালিকের তার পেয়ে ছুটে আসতে হল।"

জিজ্ঞাসা করলাম—"এখন আমরা যাচ্ছি কোথায়?"

কাপ্তেন বললেন—"রেঙ্গুন, আকিয়াবে একবার একটু থামতে হবে।"

রেঙ্গুনে! কি আশ্চর্য, ঘুণাক্ষরেও তো টের পাই নি যে রেঙ্গুনে যাচ্ছি। অনেকটা চাঙ্গা হয়ে উঠলাম। এই রকম আচমকা বর্মা যাবার সুযোগ পেয়ে যাব, এ যে কখনও কল্পনাও করতে পারি নি। নিজের বরাতকে ঠুকে একটা সেলাম নিবেদন করে দিলাম মনে মনে। রেঙ্গুনের মাটিতে একবার পা ছোঁয়াতে পারলে হয়। তার পর দেখা যাবে, বকশী মশাই কতক্ষণ আমায় আটকে রাখতে পারেন।

বর্মা মুল্লুক—ভারতবর্ষের মানচিত্রের পূব দিকটা জুড়ে রয়েছে বর্মা মুল্লুকের ছবি। মানচিত্রেই দেখা যায়, ঘোরতর কালো নীল সবুজ রঙের সমারোহ সেই ছবিতে। রহস্যময় দেশ, রহস্যময় সে দেশের মানুষ। তাদের ভাষা আলাদা, ভাব আলাদা, সাজ-পোশাক জন্মমৃত্যু বিবাহ সব আলাদা। কত বিচিত্র কাহিনী পড়া শোনা আছে বর্মা মুল্লুক সম্বন্ধে। কল্পনায় কত শত বার বর্মায় ঘুরে বেড়িয়েছি এক বিঘত লম্বা বর্মা চুরুট মুখে গুঁজে। ওদেশের বনে বনে পাহাড়ে পাহাড়ে ছুটোছুটি করেছি, একদম নিষিদ্ধ চিন্তাও—কত কি করেছি। বাঙলা আর বর্মা মুল্লুকের মধ্যেকার সমুদ্রটুকু স্বপ্নে পাড়ি দিয়েছি কতবার। আরও কত কি করেছি মনে মনে, যা বলা তো দূরের কথা,

ভাবতেও লজ্জা করে। সেই বর্মা মুল্লুকের মাটিতে পা দিতে চলেছি, সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে ঘটতে চলছে সেই উল্লেখযোগ্য ব্যাপারটা জীবনে, এতেও যার রক্তে একটু চড়া সুরের তান না ওঠে, সে তো পাষাণ। ছোট্ট জাহাজখানির দুলকি চালের তালে তাল রেখে বুকের রক্তও বেশ দুলতে লাগল। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম রেলিং ধরে। আমার মন-তরণীর কাণ্ডারীটি ততক্ষণে বর্মার মাটিতে নিয়ে আমায় নামিয়ে দিয়েছে।

দিন ফুরিয়ে গেল, কখন যে গেল তাও ঠিক টের পেলাম না। রাত আর সমুদ্র একাকার হয়ে মিশে গেল। হঠাৎ মনে হল, সমুদ্রের ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছি না, যাচ্ছি রাতের মধ্যে ভাসতে ভাসতে। এই রাত পোহাবার সঙ্গে সঙ্গে আমার জীবনের ভেসে বেড়ানোও যাবে খতম হয়ে। রাতের অন্ধকার-সমুদ্রের অন্তে দিনের আলোময় কূল দেখা দেবে। শক্ত মাটির ওপর পা দিয়ে দাঁড়াতে পারব আবার, চেনা মাটি, জানা মাটি, বহুদিনের পুরনো মাটি। হোক না সে মাটির নাম বর্মা কিংবা বোর্নিও। কিই বা এল গেল তাতে, মাটি হল মাটি। ও বস্তু এখানেও যা, ওখানেও তা! ওর ওপর যারা বাস করে, তাদের নাম মানুষ। সে মানুষ কি ভাষায় কিচির মিচির করে, কি খায়, কি পরে, তাতে বড় বয়েই গেল। মোদ্দা মানুষের মাঝে দিনের আলোয় গিয়ে দাঁড়াতে পারলেই হল, তা হলেই এই লক্ষ্যহীন বেওয়ারিস যাত্রার হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যাবে।

অনেকক্ষণ ধরে খুব মিঠে একটা সুর কানে যাচ্ছিল। কানেই যাচ্ছিল কিন্তু মনে যাচ্ছিল না। হঠাৎ সেই মিঠে সুরটার ঘাড়ে বাসনকোসন পড়ার ঝনঝন আওয়াজ লাফিয়ে পড়ল। ফলে আমিও বেশ মনে মনে খানিক লাফিয়ে উঠলাম। কেন জানি না, টপ্ করে ফিরেও দাঁড়ালাম। বোধ হয়, বাসনকোসনগুলো পড়ছে কোথায় তাই জানবার জন্যেই পেছন ফিরলাম। পেছন ফেরার সঙ্গে সঙ্গে খুবই সজোরে চমকে উঠলাম। ঠিক দু হাত দূরে একটা ডেক-চেয়ারের ওপর পড়ে আছে একটা লম্বা মূর্তি। গলা থেকে পায়ের গোছ পর্যন্ত মিসমিসে কালো কি একটা ঢাকা দেওয়া রয়েছে। এমনিই নিঃসাড়ে পড়ে আছে মূর্তিটা যে জেগে আছে না ঘুমিয়ে আছে, বোঝা গেল না।

কয়েক মুহূর্ত অন্ধকারের মধ্যেই তাকিয়ে রইলাম সেই মূর্তিটার দিকে। তার পর দেখলাম আস্তে আস্তে মূর্তিটা সোজা হয়ে উঠল। তার পর কানে গেল এক অদ্ভুত জাতের গলার আওয়াজ। বহুদূর থেকে, যেন সেই ছেড়ে আসা কক্সবাজারের কূল থেকে ভেসে এল কথা কটা।

"চলুন এবার, খেয়ে নিই গে আমরা কিছু।"

এক পা সামনে এগিয়ে গেলাম। বললাম—"আপনি জেগে আছেন? আমি ভেবেছিলাম, ঘুমিয়ে পড়েছেন বোধ হয়।"

আড়মোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়াল মূর্তিটা এবার। বলল—"ঘুমোই কেমন করে বলুন। আপনি আমার অতিথি। জাহাজে যতক্ষণ থাকব, ততক্ষণ আমরা জাহাজের আইন-কানুন মেনে চলব। খাবার ঘরে খাবার টেবিলে সেজেগুজে গিয়ে আমাদের বসতে হবে। নানারকম কায়দা করে মহা আড়ম্বরে খাওয়াবে এরা আমাদের। খাই না খাই, ঠিকঠাক করে বসা চাই। নয়তো এরা ভাববে কি বলুন তো। চলুন, আপনাকে আপনার কেবিনে নিয়ে যাই। আপনার কেবিন-বয় তার পর আপনাকে গোসলখানায় নিয়ে যাবে। একটু চাঙ্গা হয়ে উঠুন দয়া করে। আমাদের হাবভাব দেখে জাহাজের এরা মুষড়ে প'ড়ে না যেন। সমুদ্রের বুকে প্রমোদ-তরণী চড়ে স্ফূর্তি করে বেড়াচ্ছি, সেই রকম চালচলন হওয়া চাই আমাদের। আর সত্যি কথা বলতে কি, হয়েছেই বা কি এমন! আপনি ভবঘুরে মানুষ, আমার খুব ভাল লেগে গেছে আপনাকে। তাই আপনাকে নিয়ে দু-চার দিন একটু ঘুরে বেড়াতে যাচ্ছি। দুটো ভাল-মন্দ আলাপ হবে, নানা দেশের নানা গল্প শুনব আপনার কাছ থেকে। এর মধ্যে গোলমালটা কোথায়। চলুন চলুন, আর দেরি করা নয়, ডিনারের সময় পার হয়ে গেল।"

হালকা সুরের হালকা কথা, চাপা গলার একান্ত অন্তরঙ্গ আলাপ, টপ করে পরকে আপন করে নেবার অপূর্ব কায়দা। নিমেষের মধ্যেই আমার মনের মেঘ ভাসিয়ে নিয়ে গেল। জাহাজী চালের কাপ্তেনী মেজাজ একটু একটু করে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে লাগল মনের মধ্যে। শরীরেও যেন বেশ একটা গরম ভাব ফুটে উঠল, নিঃশ্বাসটাও যেন একটু তাড়াতাড়ি পড়তে লাগল। চললাম তাঁর পিছু পিছু। সামনের ডেক থেকে পর্দা দেওয়া কাঁচের দরজা ঠেলে বসার ঘরে ঢুকতে হল। নীল আলো জ্বলছে ঘরে। কার্পেটমোড়া ঘর। নানা জাতের কয়েকখানা ভেলভেট মোড়া চেয়ার, এক কোণে একটা পিয়ানো, আর এক কোণে একটা রেডিওগ্রাম। রেডিওগ্রামে রেকর্ড চড়ানো আছে। সেখান থেকেই বেরোচ্ছিল সেই মিঠে আওয়াজটা। কে জানে, অদ্ভুত সুরটা কোন্ দেশের। কখনও নামছে, কখনও চড়ছে, ঠিক যেন ঝড় উঠছে কোথাও। ঝড়ের একটা ঝাপটা চলে যাবার পর সুরটা ঝিমিয়ে পড়েছে, আবার আর একটা ঝাপটা আসার সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু করে চড়ছে। ঝড়ের সুরে সুর মিলিয়ে কোন দেশের মানুষ ঐ অদ্ভুত বাজনা বাজিয়েছে!

বকশী মশাই এক বার হাতে তালি দিলেন। চকচকে সাজ-পোশাক পরা এক জন ওধারের দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে কোমর থেকে মাথা পর্যন্ত নোয়াল। বকশী মশাই সম্পূর্ণ অবোধ্য ভাষায় ঠিক তিনটি কথা উচ্চারণ করলেন। আর একবার সে নোয়াল কোমর পর্যন্ত। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—"যান ওর সঙ্গে, আপনার কেবিনে নিয়ে যাবে। কাপড়-চোপড় সব আছে সেখানে। সব নতুন, হাতমুখ ধুয়ে কাপড় ছেড়ে আসুন। খাওয়ার ঘরে আবার দেখা হবে।"

দ্বিতীয়

॥ এক ॥

ভাসতে লাগলাম।

বিশ্বস্রষ্টার ত্রিবিধ তক্ত—জল স্থল আর অন্তরীক্ষ। তার মধ্যে মধ্যম তক্ত—মাটি পাথর দিয়ে গড়া পাকাপোক্ত নিরেট স্থলভাগটুকু হচ্ছে তাঁর ত্রিতাপ সম্পদের তোশাখানা। এই তোশাখানাটির সঙ্গে সর্বসংশ্রব চুকিয়ে দিয়ে নিষ্কলুষ নিরুদ্বেগ দশায় ভাসতে লাগলাম। ভাসার অবলম্বন—মোচার খোলার মত অতি তুচ্ছ স্টীমারখানা, তার অন্তঃকরণের সামান্য একটু ধুকধুক শব্দ আর তার চেয়ে ক্ষীণ একটু কাঁপুনি—এই রইল সম্বল। শেষ পর্যন্ত সেই সম্বলটুকুও জল আর অন্তরীক্ষের সঙ্গে ঘুলিয়ে গিয়ে বেমালুম মিলিয়ে গেল। তার পর জেগে রইলাম না ঘুমিয়ে রইলাম, তাও ঠিক বলতে পারব না।

সেই অবস্থায় ভাসতে ভাসতে হঠাৎ দেখি, এক মজাদার লুকোচুরি খেলার বুড়ী বনে গেছি। জল আর অন্তরীক্ষ জুড়ে চলছে এক ধরি ধরি ছুঁই ছুঁই খেলা। চোখ-জুড়ানো রঙের এক ফালি বাঁকা টিকলি কপালে আটকে কাজলী মেয়ে আঁধারি জল থেকে মাথা তুলে উঁকি দিলে। জলের অপর-প্রান্তে তখন লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে আলো: বেচারা ধারণা করতে পারেন নি, আঁধারি তাকে দেখে ফেলবে। আলোকে দেখতে পেয়ে ছুটল আঁধারি অন্তরীক্ষের পথ ধরে তাকে ছুঁতে। আলো ডুবল, টুপ করে লুকিয়ে ফেলল নিজেকে জলের মধ্যে। সারাটা অন্তরীক্ষ পার হয়ে পৌঁছিল যখন আঁধারি সেই জায়গাটিতে যেখানে জলে ডুব দিয়েছিল আলো, তখন সে জানতেও পারল না যে তার পিছন দিকে আলো আবার জল থেকে মুখ তুলে চুপি চুপি উঁকি দিচ্ছে। বোকা মেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে, জলের তলায় আলোকে খুঁজে ধরবার জন্যে। নিশ্চিন্ত হয়ে বুক ফুলিয়ে আলো উঠে পড়ল অন্তরীক্ষে। চলতে লাগল সোজা সেই জায়গাটিতে, যেখানে আঁধারি জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ভাল করেই জানে যে সে, জলের তলায় খোঁজা শেষ হলে আবার আঁধারি জলের উপর মাথা তুলবে। হলও ঠিক তাই, জলের তলায় খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে যে মুহূর্তে আঁধারি আবার মাথা জাগালে, সেই মুহূর্তে আলো অপর প্রান্তে দিলে ডুব। চলতে লাগল এই মজার খেলা নীরবে নিঃশব্দে জলে আর অন্তরীক্ষে। সেই খেলার বুড়ী সেজে চুপচাপ ভাসতে লাগলাম আমি আলো-আঁধারির মাঝখানে।

ধরা ছোঁয়া খেলার বুড়ীর পদটি বজায় রাখতে হলে অপক্ষপাতিত্বের পরাকাষ্ঠায় পৌঁছানো প্রয়োজন। নির্জলা নিরপেক্ষতার নেশায় বুঁদ হয়ে গেলে

বর্তমানের বালাই থাকে না, ভবিষ্যতের ভয় ঘুচে যায়। তখন থাকে শুধু ভূত নিয়ে কারবার। যা অতীত, যা ইতিহাস, যা শেষ হয়ে গেছে, থেমে গেছে, ফুরিয়ে গেছে, তাই নিয়ে মশগুল থাকতে না পারলে একচোখোমির দায় থেকে নিষ্কৃতি নেই। তখন যে মনটুকু বেঁচে থাকে, তা হল ঐকান্তিক ঐতিহাসিকের মন। সে মন পাষাণ দিয়ে গড়া, তার গায়ে আঁচড় লাগলেও দাগ ফুটে থাকে না।

আমার মনের গায়েও বিন্দুমাত্র দাগ লাগল না। মরা ইতিহাস একঘেয়ে ঘ্যানঘেনে অর্থহীন সুরে আওড়াতে লাগল তার মর্মবাণী, সে সুর কানের দরজায় ধাক্কা দিয়ে ফিরে গেল। মর্ম পর্যন্ত পৌঁছতেই পারল না।

মরা ইতিহাসের প্রচ্ছদপট ঢেউ খেলানো টিন দিয়ে বানানো। প্রচ্ছদপটের ভেতর চলেছে আধুনিক প্রস্তর যুগ। বিশাল একটা মাঠ, ঢেউ খেলানো টিন দিয়ে এমন ভাবে ঘেরা হয়েছে যে, ভেতরে কি হচ্ছে, তা বাইরে থেকে টের পাওয়ার উপায় নেই। একদা একটি ছোট ছেলে তার দাদার হাত ধরে এসে পৌঁছল সেই টিনের বেড়ার পাশে। দাদা তাকে নিয়ে গেট পার হয়ে ভেতরে ঢুকল।

ভয়ঙ্কর ব্যাপার চলেছে ভেতরে। বড় বড় পাথরের চাঙড়, কত তার কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই, পড়ে আছে চারিদিকে। ঠক্ ঠক্ ঠক্ ঠক্—হাজার হাজার হাতুড়ির আওয়াজ উঠছে। বিস্তর মানুষ ছেনি হাতুড়ি দিয়ে কাটছে সেই পাথরগুলো। চাঁচছে, ঘষছে, নানা রকমের নানা আকারের বানিয়ে ফেলছে।

ব্যাপার দেখে বেশ ঘাবড়ে গেল ছেলেটি, তার বিস্ময়ব্যাকুল দুই চোখে ফুটে উঠল অজস্র কি এবং কেনর ভিড়। কোথা থেকে জুটল এত পাথর? কারা বয়ে আনলে এই পাথরগুলো? করবে কি এরা পাথরগুলো দিয়ে? এই পাথুরে জঙ্গলের মধ্যে তার দাদা করেই বা কি? এই ভয়ঙ্কর আওয়াজের ভেতর এরা আছে কি করে?

সে সময় কোনও প্রশ্নই সে করতে পারলে না। করলে তার দাদা শুনতেও পেত না কিছু সেই বিকট আওয়াজের মধ্যে। দাদার হাত ধরে চলতে লাগল সে আরও ভেতরে। শেষে পৌঁছে গেল দাদার কাজের জায়গায়। ছোট একটা কাপড়ের ঘরের মধ্যে একখানা টেবিলের ওপর নানা রকম আঁকজোখ কাটা সব কাগজ নিয়ে তার দাদা কাজ আরম্ভ করলে। চুপ করে এক পাশে বসে ছেলেটি দেখতে লাগল দাদার কাজ করা। সেই বয়সে সে এইটুকু মাত্র জানতে পেরেছিল যে, এই কাজ করে তার দাদা যা টাকা পায়, তাই দিয়ে তাদের সংসার চলে। তাদের মা তাঁদের দুই ভাইকে নিয়ে কোনও রকমে দিন চালান দাদার কাজ করা টাকাকটি সম্বল করে।

ক্রমে সে জানতে পারলে, পাথরের পর পাথর সাজিয়ে এক বিশাল মন্দির

বানানো হচ্ছে সেখানে। ইংরেজদের দেশে কে এক মহারাণী ছিলেন, তাঁর নামেই নাকি ঐ মন্দির উৎসর্গ করা হবে। মন্দিরটা এমনই শক্ত করে বানানো হচ্ছে, যাতে দু-চার হাজার বছর টিকে থাকে। তা হলে দু-চার হাজার বছর মানুষে সেই ইংরেজদের মহারাণীর নামটা ভুলবে না!

ইতিহাসের দ্বিতীয় পাতায় পাওয়া গেল, ইংরেজদের মহারাণীর স্মৃতি-সৌধ অনেকটা ওপরে উঠে গেছে। বাঁশের সঙ্গে বাঁশ বেঁধে বিশাল এক বাঁশের কেল্লা উঠে গেছে আকাশের কাছাকাছি। তার মাঝে তৈরী হচ্ছে পাথর-দুর্গ।

সেই বাঁশের কেল্লার গোড়ায় এক দিন সকালে ছোটখাটো একটা ভিড় জমেছে। সেই ভিড়ের মধ্যে সেই ছোট ছেলেটি এসে দাঁড়িয়েছে। অদ্ভুত চাউনি তার চোখে। অদ্ভুত ভাবে সে তাকিয়ে আছে একটা মস্ত বড় পাথরের দিকে। সেই পাথরখানার তলা থেকে বেরিয়ে আছে তার দাদার মাথাটা আর একখানা হাত। যারা সেখানে জমেছে, তারা পাথরখানাকে সরিয়ে তার দাদাকে বার করে আনার মতলব ভাঁজছে।

মরা ইতিহাসের মরা পাতায় ইংরেজ রাণীর নাম জিইয়ে রাখার মহাসৌধ আঁকা হয়ে গেল যথাকালে। কিন্তু সেই ছোট ছেলেটিকে আর পাওয়া গেল না কোথাও। তার মাকেও পাওয়া গেল না! ইতিহাস তাদের নাম ভুলে গেল।

তার পর যেখানে আবার ইতিহাসের আলো পড়ল, সে জায়গাটা সেই মহা-রাণীর স্মৃতিসৌধ থেকে অনেক দূর। সেটা মহানগরী নয়, সেখানে কেউ কারও নামে পাথর গাঁথবে না, কিন্তু সেখানেও ইতিহাস গড়ার মালমশলা মেলে। কারণ সেখানে বাস করেন নাগ মহাশয় আর নাগিনী মহাশয়া।

আড়াই সের দুধে তোলা দু-এক আফিং জ্বাল দিতে থাকলে যে সরখানি তৈরী হয়, সেই সরখানি মাত্র আহার করেন নাগ মহাশয়। তার স্ত্রী নাগিনী মহাশয়া সরের তলায় যে দুধটুকু পড়ে থাকে, সেটুকু পান করেন। পার-লৌকিক কারবার করেন তাঁরা। ইহলোকের বহু গণ্যমান্য মানব-মানবী তাঁদের খদ্দের। মস্ত বড় এক বাগানের মধ্যে মস্ত বড় এক অট্টালিকা। সেই অট্টালিকায় বাস করেন নাগ মহাশয় আর নাগিনী মহাশয়া। নিভৃতে লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে তাঁদের সাধন ভজন। গোটাদুয়েক চাকর থাকে মাত্র তাঁদের সঙ্গে। তারা বাঙালী নয়, কি যে করেন তাদের মনিবরা তা নিয়ে তারা মাথা ঘামায় না। ঘামাবার মত মাথাও নয় তাদের। কিন্তু হঠাৎ এক দিন জুটল সেখানে একটি ছোকরা। নাগেদের এক ভক্ত তাকে নিয়ে এসে সেখানে রেখে গেল। গুরুদেব এবং গুরুঠাকুরুনের সেবা করবে। তিন কুলে কেউ নেই ছোকরার, আশ্রয় পেয়ে বর্তে গেল।

ইতিহাসে তার পরিচয় লেখা নেই, কিন্তু তাকে চেনা গেল। কয়েক বছর আগে যে ছেলেটিকে দেখা গিয়েছিল ইংরেজ রাণীর আধা তৈরী স্মৃতিসৌধের পাশে, যে ছেলেটির চোখে বোবা পশুর চাউনি ফুটে উঠেছিল তার দাদাকে পাথরের তলায় দেখে, সেই ছেলেটির আধা বোকা, আধা চালাক চাউনিই যেন দেখা গেল ছোকরাটির চোখে। লম্বা হয়েছে খানিকটা, ওপরের ঠোঁটে সামান্য একটু কাল ছোপ ধরেছে, চোয়ালের হাড় দুটো অনেকটা ঠেলে উঠেছে আর চোখের দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে সন্ত্রাসের ছায়া। খুঁটে খাবার মত বুদ্ধি জন্মাবার আগেই যার মাথার ওপর থেকে ছাউনি উড়ে যায়, তার চোখে ফুটে ওঠে ঐ জাতের সন্ত্রাস। ছোকরা নাগ মহাশয় নাগিনী মহাশয়াব সেবায় লেগে গেল।

পারলৌকিক কাজ-কারবার, তার মাথা-মুণ্ডু কিছুই বোঝার উপায় নেই। নিশীথ রাতে সেই অট্টালিকার ছাতে উঠে নাগিনী মহাশয়া এক গাছা ঝাঁটা হাতে নিয়ে গালমন্দ করেন কাকে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা পার হয়ে যায়, নাগিনী মহাশয়ার গলা ভেঙে আসে, গালমন্দ করা থামে না। ভোর হবার আগে তিনি নামেন ছাত থেকে। তার পর সারাদিন মড়ার মত পড়ে থাকেন। নাগ মহাশয়ের বয়স নেহাত কম নয়। শরীরখানি কিন্তু বেশ হালকা। কোনও কোনও রাতে তিনি চড়ে বসেন মস্ত এক নিম গাছের মগডালে। সারাটা রাত সেই গাছের ডালেই কাটিয়ে দেন। সেখান থেকে শোনা যায় উদ্ভট গলার স্বর, কিম্ভূত-কিমাকার গলার আওয়াজ বার করেন তিনি, অবোধ্য কতকগুলো মন্ত্র ক্রমাগত উচ্চারণ করে যান। ভোরে যখন গাছ থেকে নেমে আসেন, তখন আর তাঁর মুখের দিকে তাকানো যায় না। চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসবার যোগাড় করছে, গলার শিরগুলো ফুলে উঠেছে, মুখে চোখে এক বিন্দু রক্ত নেই।

এই সমস্ত সাধন ভজন ছাড়া মাঝে মাঝে খুব ঘটা করে পূজাও হয়। সিন্দুর মাখানো এক ঘট আছে, তার পাশে পোঁতা আছে এক রক্তবর্ণ ত্রিশূল। সেই ঘটের সামনে পূজায় বসেন নাগ মহাশয়, নাগিনী মহাশয়া থাকেন তাঁর বাঁ পাশে। সমস্ত রাত ধরে পূজা চলে। বড় বড় শিষ্য-শিষ্যারা উপস্থিত থাকেন সেই সব পূজায়। পূজার শেষে তাঁরা নানা রকম প্রশ্ন করেন, নাগিনী মহাশয়া জবাব দেন। সেই জবাব দেওয়ার ধরনও বড় ভয়ানক। সে সময় নাগিনী মহাশয়ার বিন্দু মাত্র হুঁশ জ্ঞান থাকে না। অনেকক্ষণ তিনি সোজা হয়ে বসে থাকেন আসনে, দু চোখ বোজা থাকে। তার পর একটু একটু দুলতে শুরু করেন সামনে পেছনে, মাথা ঝাঁকাতে শুরু করেন, বিড়বিড় করে কত কি বলে যান। সেই সময় যার যা জানবার তা বলে নাগ মহাশয়কে। নাগ মহাশয় চিৎকার করে কথা বার বার শোনান নাগিনী মহাশয়াকে। হঠাৎ নাগিনী মহাশয়া

চোখ খোলেন, ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে তাকান প্রশ্নকর্তার দিকে, খুব নোংরা একটা গালাগালি দেন, তার পর তার প্রশ্নের জবাবটি দিয়ে আবার চোখ বন্ধ করে দুলতে থাকেন। এই অবস্থায় কাটে কিছুক্ষণ, দশ-বারোটি প্রশ্ন হয়ে গেলে নাগ মহাশয় আর প্রশ্ন করতে দেন না। কয়েকটা লাল ফুল দেন নাগিনী মহাশয়ার মাথার ওপর, বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়তে পড়তে ঘটের জলের ঝাপটা দেন নাগিনী মহাশয়ার চোখে মুখে। কিছুক্ষণ পরেই ঢুলে পড়েন নাগিনী মহাশয়া, তার পর সেখানেই বেঘোরে ঘুমোন। তখন আর তাঁকে কারও ছোঁয়ার হুকুম নেই। যতক্ষণ না তাঁর ঘুম ভাঙবে, ততক্ষণ তাঁর ধারে কাছে কাউকে যেতে দেন না নাগ মহাশয়। একটু দূরে বসে খুব সতর্ক হয়ে পাহারা দেন। তখন শিষ্য-শিষ্যা ভক্তরা আর তাঁদের কাছে থাকতে পান না।

বিচিত্র সব আচার অনুষ্ঠান, রহস্যময় মন্ত্র তন্ত্র পূজা অর্চনা, অলৌকিক শক্তি সামর্থ্যের ভেলকিবাজি দেখানো। এ সমস্তর কোনও কিছুই মাথায় ঢুকত না ছোকরাটির। জানতে পারলে সে, এরই নাম নাকি ভর হওয়া। নাগিনী মহাশয়ার ওপর ভর হয়, সাক্ষাৎ মা কালী বনে যান তখন নাগিনী মহাশয়া। সে সময় যাকে যা বলেন, নির্ঘাত ফলে যায়। সকলের সব প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন, ইচ্ছে করলে আর দয়া হলে সকলের মনের বাসনাও পূর্ণ করতে পারেন।

মনের বাসনা কত রকমের কত জাতের হতে পারে, সে সম্বন্ধেও কিছু মাত্র ধারণা ছিল না ছোকরাটির, তার নিজের মনের আশা আকাঙ্ক্ষা ভারী পাথরের চাপে চেপ্টে মরে গিয়েছিল। তবু এক এক সময় কেমন যেন একটা বোবা ব্যথায় টন্‌টন্‌ করে উঠত তার ভেতরটা। মার কথা মনে পড়ত, দাদাকে মনে পড়ত। তখন কেমন যেন বড় একা একা মনে হত নিজেকে। মনে হত, এত বড় দুনিয়াটায় তার নিজের বলতে কেউ নেই। এই কাঙালপনাটা পাছে কেউ টের পায়, এই জন্যেই বোধ হয় সে সকলকে এড়িয়ে চলত।

নাগিনী মহাশয়াকে কিন্তু এড়িয়ে যেতে পারল না। হুঁশ জ্ঞান যখন তাঁর ষোল আনা বজায় থাকত, সে রাতে তিনি ছাতে উঠে গালমন্দ দিতেন না। যে দিন তিনি মুখ গুঁজে পড়ে থাকতেন না, সেদিন পড়তেন ছোকরাটিকে নিয়ে। তাকে নাওয়ানো খাওয়ানো ভাল কাপড়-চোপড় পরানো থেকে শুরু করে ঘুম পাড়ানো পর্যন্ত সব নিজে হাতে করতে চাইতেন। এত দূর পর্যন্ত সহ্য করতে পারত না ছোকরাটি, সে বয়স তার পার হয়েছিল বলেই বোধ হয় অতটা বরদাস্ত হত না তার। কিন্তু পরিত্রাণ পাবার কোনও উপায় ছিল না। নাগিনী মহাশয়া একেবারে মানতেই চাইতেন না যে অতটা বাড়াবাড়ি করা বেমানান হয়ে পড়ছে।

আর এক জনও সইতে পারতেন না নাগিনী মহাশয়ার ঐ জাতের খেপামি। বলতেন না তিনি কিছুই, শুধু মাঝে মাঝে তাঁর চোখে দেখা দিত অদ্ভুত এক আলো। চকচকে ছুরির ফলার গায়ে রোদ পড়লে যে জাতের আলো ঠিকরে ওঠে, সেই জাতের চোখ ঝলসানো আলো হঠাৎ দেখা যেত নাগ মহাশয়ের চোখে। বেশীক্ষণ স্থায়ী হত না সে আলো, নাগিনী মহাশয়ার চোখে চোখ পড়বার সঙ্গে সঙ্গে নিভে যেত। মাঝে মাঝে তিনি খুব ভাল একটি প্রস্তাব করতেন। বলতেন—"দেখ, ছোকরাটাকে বরং কোথাও কোনও স্কুলে ভরতি করে দেওয়া যাক। লেখাপড়াটা শিখুক, এখানে থাকলে ওর পরকালটা ঝরঝর হয়ে যাবে যে।" কিন্তু ঐ প্রস্তাব পর্যন্তই এগোত ব্যাপারটা, নাগিনী মহাশয়া কানও দিতেন না। উলটে আদর যত্নের অত্যাচারটা আরও বেশী বেড়ে যেত ছোকরাটির ওপর, তাতে তার প্রাণ আরও অতিষ্ঠ হয়ে উঠত।

নাগ-নাগিনীর এই ঠাণ্ডা লড়াই ঠাণ্ডা অবস্থায় রইল না চিরকাল। এক দিন পূজার পর নাগিনী যথাবিধি ঢুলে পড়লেন, শিষ্য-শিষ্যারা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে, শুধু নাগ রইলেন ঘরে। তখন কি যে ঘটল, বলা যায় না। হঠাৎ বিকট রকম গোঁ গোঁ আওয়াজ উঠল ঘরের মধ্যে, ছুটে গিয়ে সকলে জড়ো হল দরজার সামনে। দেখা গেল—নাগিনী অনবরত হাত পা ছুঁড়ছেন, গড়াগড়ি খাচ্ছেন, মুখ নাক দিয়ে রক্ত ছুটছে তাঁর, কোনও অদৃশ্য হস্ত যেন তাঁকে আছড়াচ্ছে মেঝের ওপর। আর একটা ব্যাপারও যেন বোঝা গেল, সেই বেহুঁশ অবস্থায় কি যেন ধরবার চেষ্টা করছেন নাগিনী। নাগ মহাশয় নাগিনীর নাগালের বাইরে থাকবার জন্যে লাফালাফি করছেন আর জলের ঝাপটা দিচ্ছেন নাগিনীর গায়ে। হঠাৎ নাগিনী খানিকটা খাড়া হয়ে উঠে বসলেন, অন্ধের মত দুখানা হাত মেলে দিলেন সামনে, পরমুহূর্তেই আছড়ে পড়লেন মেঝেয়। মুখখানা মেঝের ওপর ঠুকে গেল ভীষণ ভাবে, অনেকটা রক্ত ছিটকে পড়ল চারিদিকে। আর সহ্য হল না ছোকরাটির, লাফিয়ে পড়ল সে ঘরের মধ্যে। নাগ মহাশয় বাধা দেবার ফুরসতই পেলেন না, ছুটে গিয়ে ছোকরা নাগিনীর মাথাটা ধরে ফেললে। সঙ্গে সঙ্গে ঘটে গেল ভয়ংকর কাণ্ড, দু হাত মাথার দিকে সোজা হয়েই ছিল নাগিনীর। হাত দুখানা সাঁড়াশির মত চেপে ধরলে ছোকরাটিকে। "গেল, গেল, সর্বনাশ হয়ে গেল"—চিৎকার করে উঠলেন নাগ মহাশয়। তার পর যা ঘটল, ইতিহাস তা বললে না।

ইতিহাস তাদের নিয়ে মাথা ঘামায় যারা পূর্বজন্মের কর্মফল ভোগবার দরুন ইহজন্মে কর্ম করে বেড়ায়। কিন্তু যে বেচারা পরজন্মের কর্মভোগটা ইহজন্মে ভুগছে, তাকে নিয়ে মাথা ঘামায় কে? খোঁচা খোঁচা কয়েকটা নতুন গোঁফ দাড়ি, একমাথা জট পাকানো চুল, শতগ্রন্থি দেওয়া একখানা ময়লা

কাপড় পরা যে লোকটা হাটে মাঠে ঘাটে লোকের লাথি ঝাঁটা খেয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল, তার নাম ইতিহাসের পাতায় ওঠে নি। ও রকম জীব এন্তার চরে বেড়াচ্ছে সর্বত্র, চরতে চরতে বেমালুম কে কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে, কার গরজ পড়েছে খোঁজ রাখার। কিন্তু ওদের এক জন হারাল না, ঘুরতে ঘুরতে শেষ পর্যন্ত আটকে গেল। বাঁধা পড়ল একটা খোঁটায়। তার পর আবার তাকে নিয়ে ইতিহাস রচনা হতে লাগল।

মহকুমা আদালতের ধনুর্ধর উকিল গঙ্গেশ গাঙ্গুলী আদালতের আইনের সঙ্গে অধ্যাত্মবিদ্যাটাও আত্মসাৎ করে ফেলেছিলেন। সাধু সন্ন্যাসী ফকির দরবেশ যাকে যখন হাতের কাছে পেতেন, ধরে নিয়ে যেতেন নিজের বাড়িতে। তাবিজ কবচ, মন্ত্র মাদুলি, জড়ীবুটী, অব্যর্থ ওষুধ, কত কি যে তিনি জুটিয়েছিলেন, তার ঠিকঠিকানা নেই। সাধু সন্ন্যাসীর সেবা করার ফলে তাঁর ভেতরেও এক জন সাধু সকলের নজর এড়িয়ে বেড়ে উঠছিল। তার ফলে তিনি এক পরমাশ্চর্য দৃষ্টিশক্তি লাভ করেছিলেন। পাগলের মত কাউকে ঘুরে বেড়াতে দেখলেই তিনি বুঝতে পারতেন, লোকটি কি অপরিসীম শক্তির অধিকারী। বুঝতে পেরেই পাকড়াও করতেন তাকে, ধরে নিয়ে যেতেন নিজের বাড়িতে, সেবা শুরু করে দিতেন তার। যতক্ষণ না সামান্য একটু কৃপা লাভ করতেন, ততক্ষণ কিছুতে ছেড়ে দিতেন না।

এক দিন বিকেলে আদালত থেকে বেরতেই গঙ্গেশ গাঙ্গুলীর নজর পড়ে গেল একটা পাগলের ওপর। জহুরীতে জহর চেনে, সুতরাং জহর চিনতে তাঁর এতটুকু দেরি হল না। কাঁচা বয়সে সংসার ত্যাগ করে যে ওভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সে নিশ্চয়ই কম শক্তির অধিকারী নয়। তৎক্ষণাৎ ধাওয়া করলেন তার পেছনে এবং বহু সাধাসাধনা করে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তুললেন। তার পর যখন দেখলেন যে লোকটার মাঝে মাঝে হিস্টিরিয়ার মত হয়, মুখ দিয়ে গাঁজলা ভাঙতে থাকে,—সে অবস্থায় বিড় বিড় করে অবোধ্য ভাষায় কত কি বকে, তখন আর তাঁর সন্দেহের অবকাশ রইল না যে বহু জন্মের পুণ্যফলে আসল একটি মহাপুরুষ শেষ পর্যন্ত জুটেছে তাঁর কপালে। ভক্তির বহরটা বেশ বেড়ে গেল, তাঁর প্রকাণ্ড বাড়ির নির্জন একটা ঘরে নজরবন্দী করা হল মহাপুরুষকে, সস্ত্রীক সপরিবার গাঙ্গুলী মহাশয় লেগে গেলেন মহাপুরুষের রহস্য উদ্ঘাটন করতে।

রহস্য জিনিসটার মজা হচ্ছে, ওটা টানলে বাড়ে। একটা রহস্য ধরে টানাটানি জুড়লে আরও দশটা দশ জাতের রহস্য তার পিছনে পিছনে এসে উপস্থিত হয়। সেগুলোর শেষ পর্যন্ত পৌঁছবার আগেই দেখা যায়, এক পাল রহস্য দূর থেকে উঁকি দিয়ে রসিকতা জুড়ে দিয়েছে। সেই রসিকতা দেখে

হাড় জ্বলে ওঠে, তখন 'নিকুচি করেছে' বলে রহস্যের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। যাঁরা চালাক মানুষ, তাঁরা কখনও কোনও রহস্যের ভেতর নাক গলাতে যান না। তাঁরা জানেন, ও বস্তু যত চাপা থাকে, ততই ভাল। খামকা কেঁচো খুঁড়তে সাপের গায়ে খোঁচা দিয়ে কি লাভ!

গঙ্গেশ গাঙ্গুলীর মহাপুরুষ যাচাই করাটাও শেষ অবধি ঐ কেঁচো খুঁড়তে সাপকে খোঁচানো হয়ে দাঁড়াল। রাশি রাশি উৎকট রহস্য ঘিরে ধরল তাঁর সংসারকে। রহস্যের চাপে তাঁর দম বন্ধ হবার যোগাড় হল! উপযুক্ত সব ছেলেমেয়ে-নাতিনাতনী, সামাজিক প্রতিষ্ঠা, আড়াই কুড়ি বছরের সাধনার ফল, তাঁর সাজানো সংসার, সেই সংসার-দুর্গের শক্ত বনিয়াদে মস্ত বড় ফাটল ধরল।

॥ দুই ॥

সংসার-দুর্গের ভিত্তি গাঁথার মশলা তৈরী হয় দু জাতের দুটি ভেজাল পদার্থের সংমিশ্রণে। পদার্থ দুটির নাম—মেনে নেওয়া আর মানিয়ে চলা। রাশি রাশি চোখের জল আর বুকের রক্ত দিয়ে নরম করতে হয় ঐ দুটি শুকনো গুঁড়োকে। তার ফলে তাতে রস জমে, আঠালো হয়। ঐ আঠালো মশলার গুণে বড় বড় বিশ্বাস আর নির্ভরতার চাঙড়গুলো গায়ে গায়ে আটকে থাকে। তখন সেই ভিত্তির ওপর একতলা, দুতলা দশতলা, যত তলা খুশি সংসার-অট্টালিকা গড়ে তোলা যায়।

কপাল দোষে যদি রস শুকিয়ে ঝুরঝুরে হয়ে যায় মশলাটা এক দিন, তখন বিশ্বাস আর নির্ভরতার চাঙড়গুলো আটকে থাকবে কিসের টানে! এ দুর্ঘটনা নানা কারণে ঘটতে পারে। মেনে নেওয়ার সঙ্গে মানিয়ে চলার ভাগের কমবেশি হলে মশলাটা তেমন আঠালো হয় না। আবার বিশ্বাস আর নির্ভরতার চাঙড়-গুলো খুব শক্ত না হলে ওগুলোও রস টেনে নিতে পারে মশলা থেকে। কিংবা যদি আধ্যাত্মিক নোনা লাগে, তাতে মশলাটা আর মশলা থাকে না। স্রেফ তার আঠালো গুণটুকু উবে চলে যায়। এ সমস্ত ন্যায্য অন্যায্য কারণ ছাড়া আরও এমন একটি অদ্ভুত কাণ্ড ঘটতে পারে, যার দরুন ভিত্তির তলায় তোল-পাড় লেগে যায়। সেই তোলপাড়ের তোড়ে খুব মজবুত গাঁথুনির সংসার-ইমারতও ডিগবাজি খেয়ে পড়ে ভূমিসাৎ হয়ে যায়।

এই ভয়ানক কাণ্ডটা ঘটে যখন ইতিহাস রসিকতা করে বসে কোনও সংসারের সঙ্গে।

ইতিহাসের চলন পেছন দিকে, সমুখ পানে মুখ রেখে সে পিছু হেঁটে চলে। তাই সে নিজের পেছনটা দেখতে পায় না, যতটুকু পিছোয় ঠিক তত-টুকু সামনে দেখতে পায়। আর সেইটুকুই ইতিহাস দেখায় সকলকে। তার

পিছনে অন্ধকার রহস্যের গর্ভে কি আছে, তা সে নিজেও জানে না, কাউকে জানাতেও পারে না। কিন্তু একদা যদি হঠাৎ সে ঘুরে দাঁড়ায়, তার নিজের পিছনে কি আছে তা জেনে ফেলে, তখন সেই ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের উলটো টানে পাহাড়-পর্বত যায় ভেসে, সামান্য সংসার-ইমারত কি করে টিকবে!

গঙ্গেশ গাঙ্গুলীর আধ্যাত্মিক রহস্য উদ্‌ঘাটন করার সাধনা ইতিহাসকে পিছন ফিরতে বাধ্য করলে। তাঁর দুই-কম-পঞ্চাশ বছরের সহধর্মিণী, সুধীর, অধীর, সুনীতা, অনীতার গর্ভধারিণী, দীপু, শিবু, বাবলি, কাবলির দিদিমা, শুভাশীষ, দেবাশীষের ঠাকুমা শ্রীযুক্তা ফুল্লনলিনী দেবী, যাঁর নামে গাঙ্গুলী মশাই স্বোপার্জিত অর্থে তিনখানা বাড়ি বানিয়েছেন, এক বান্ডিল চা বাগানের শেয়ার কিনে রেখেছেন, তিনি আচম্বিতে ঘোষণা করে বসলেন, ইতিহাসের পিছন দিকটা তিনি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন। ইতিহাস তাঁর সামনে দু হাত মেলে দাঁড়িয়ে তাঁর নজরকে আটকাচ্ছে না। তিনি দেখতে পাচ্ছেন, গাঙ্গুলী মশায়ের সংসার তাঁর সংসার নয়। গাঙ্গুলী মশাইকে তিনি চিনতেও পারছেন না। সংসার-ভরতি ছেলে-মেয়ে নাতি-নাতিনী কাউকে চিনতে পারছেন না। পারছেন শুধু তাঁর একমাত্র সন্তান, তাঁর বুকজুড়নো ধনটিকে। যে ছেলেকে তিনি আটচল্লিশ আর ষোল চৌষট্টি বছর আগে কোথায় যেন ফেলে এসেছিলেন, সেই সন্তান ফিরে এসেছে তাঁর কাছে। ব্যাস, আর তিনি কিছুই চান না। এক মুহূর্ত গাঙ্গুলী-বাড়িতে থাকতে পারবেন না। এই পরের বাড়িতে এক গণ্ডূষ জলও গলবে না তাঁর গলা দিয়ে। তিনি তাঁর সন্তানটিকে নিয়ে তাঁর নিজের বাড়িতে ফিরে যাবেন।

বিনা মেঘে বজ্রাঘাত ব্যাপারটার মধ্যে যে আঘাতটুকু আছে। তার জ্বালা-পোড়া কতটুকু কমে যদি মেঘাচ্ছন্ন আকাশ থেকে বজ্রপাতটি হয়! মেঘে ঢাকা আকাশে বজ্র লুকিয়ে থাকে, খটখটে রোদে চকচকে আকাশে বজ্রের পক্ষে আত্ম-গোপন করে থাকাটা অসম্ভব। সেই অসম্ভব সম্ভব হয় যখন তখন আঘাতের চেয়ে আকস্মিকতাটা বড় বেশী বাজে প্রাণে। ওইটুকুই বিনা মেঘে বজ্রাঘাত ব্যাপারটার আসল জ্বালা।

গঙ্গেশ গাঙ্গুলী এবং তাঁর সংসারের পক্ষে সংসার-কর্ত্রীর ঘোষণাটি বিনা মেঘে বজ্রপাত তুল্য হয়ে দাঁড়াল। এ ক্ষেত্রে ঐ ঘোষণাটি যদি বাড়ির অবিবাহিতা কন্যাটি বা নবাগতা ছোট বৌমাটি বা এঁচড়েপাকা বড় নাতিটি করত, তা হলে মেঘে ঢাকা আকাশ থেকে বজ্রপাত তুল্য হত। কিন্তু এ কি ব্যাপার! তিন কাল পার করে চতুর্থ কালে পা দিয়ে এ হেন বেচাল চাল দেবেন শ্রীযুক্তা ফুল্ল-নলিনী স্বয়ং, এটা কেউ সহজে বিশ্বাসই করতে পারলেন না। তাড়াতাড়ি

ব্যাপারটাকে একটা আধ্যাত্মিক জামা পরাবার জন্যে উঠে পড়ে লাগলেন কর্তা আর তাঁর ছেলেমেয়েরা। অতি অল্প সময়ের মধ্যে মহকুমা শহরের গণ্যমান্য সকলেই জেনে ফেললেন যে গাঙ্গুলী গিন্নী আসল বস্তু পেয়ে গেছেন। হবে না কেন, হতেই হবে যে। যাঁর স্বামী অত বড় উকিল হয়েও সাধুসন্ত বাউল বৈরাগী যাকে যখন হাতের কাছে পেয়েছেন, তাকেই সেবা করবার জন্যে বাড়িতে ধরে নিয়ে গিয়ে সস্ত্রীক পুণ্যার্জন করেছেন, তিনি আসল বস্তু লাভ করবেন না তো করবে কে! ছুটলেন সকলে গাঙ্গুলীবাড়িতে গাঙ্গুলী-গিন্নীর কৃপা লাভ করতে। গিয়ে যা দেখলেন, তাতে আসল ব্যাপারটাই কেমন যেন ঘুলিয়ে উঠল। গাঙ্গুলী-গিন্নী এমন ভয়ানক কিছু পেয়ে ফেলেছেন যে, তাঁর আড়াই কুড়ি বছরের সাধনার ফল সাজানো সংসারটাকে খড়কুটোর মত জ্ঞান করছেন। পাড়া-প্রতিবেসী চেনা জানা কাউকে চিনতে পর্যন্ত পারছেন না। গোঁ ধরে বসেছেন ঘরে খিল এঁটে, এখনই তিনি এই সংসার ত্যাগ করবেন। তাঁর একমাত্র সন্তানটির হাত ধরে তাঁর নিজের ঘরে গিয়ে উঠবেন। গাঙ্গুলী-বাড়ি থেকে তাঁকে বেরতে না দিলে এক বিন্দু জলও মুখে দেবেন না। যাঁরা গাঙ্গুলী-গিন্নীর দর্শন লাভ করতে গিয়েছিলেন তাঁরা ক্ষুন্ন মনে ফিরে গেলেন।

আইন বিদ্যাটাও আধ্যাত্মিক বিদ্যার সঙ্গে ধাতস্থ করেছিলেন যিনি, সেই গঙ্গেশ গাঙ্গুলী অত সহজে তাঁর হক দাবি ছাড়তে চাইলেন না। প্রথমে অনুনয়-বিনয় বোঝানো, তার পর ডাক্তার-বদ্যির ঠেঙানো, কোনটাই বাদ দিলেন না তিনি এবং তাঁর পুত্রেরা। অত্যাচারটা গাঙ্গুলী-গিন্নীকে টপকে সদ্যলব্ধ ছোকরা মহাপুরুষটির ওপর ষোল দুগুণে বত্রিশ আনা বর্তাল। হাভাতে হত-ভাগাটা নিশ্চয়ই কিছু খাইয়েছে বাড়ির গিন্নীকে বা তুকতাক করেছে, যার ফলে মাথাটাই বিগড়ে গেছে গিন্নীর, এই সন্দেহে তাকে আটকানো হল। মহকুমা শহরের মহকুমা হাকিম আর মহকুমা পুলিস সাহেব অত বড় উকিলের অতবড় বিপদে নিস্পৃহ থাকতে পারলেন না। সকল অনর্থের হেতু, আধা-খেপা গো-বেচারা প্রাণীটির ভেতর থেকে আসল কথা বার করবার জন্যে তার ওপর দিয়ে বথাবিহিত পেষণ চলতে লাগল। তার ফল হল আরও মারাত্মক জাতের। শহরের অপর প্রান্তে পুলিসের ফাঁড়ির মধ্যে যা যা ঘটতে লাগল ছোকরাটির ভাগ্যে, তার খুঁটিনাটি বিবরণ ঘরের মধ্যে বন্ধ থেকে আওড়াতে লাগলেন গাঙ্গুলী-গিন্নী। সর্বশেষে তিনি শুনিয়ে দিলেন যে এ বাড়ির প্রতিটি জীবের ঘাড় মটকে রক্তপান করে তবে তিনি ছাড়বেন।

আরম্ভ হয়ে গেল ঘাড় মটকানো। দোতলা থেকে একতলায় নামছিল বাড়ির বড় ছেলে সুধীর, আচম্বিতে পেছন থেকে কে তাকে মারলে এক ধাক্কা। ছিটকে এসে পড়ল সে সিঁড়ির তলায়, নাক মুখ দিয়ে রক্ত ছুটল। ধাক্কাটা যে কে মারল,

তা বোঝাই গেল না। ছোট বৌমা এক কড়াই দুধ জ্বাল দিচ্ছিলেন, উনুনের ওপর থেকে ফুটন্ত দুধ সুদ্ধ কড়াটা ঘুরতে ঘুরতে উঠে গেল ছাত পর্যন্ত। তার পর ছাতে গিয়ে ধাক্কা খেয়ে সব দুধটা পড়ল তার মাথায়। সর্বাঙ্গে ফোসকা নিয়ে তিনি হাসপাতালে চলে গেলেন। বড় নাতি শুভাশীষ চাপা পড়ল খাট-বিছানার তলায়। ঘুমোচ্ছিল সে খাটে শুয়ে, হঠাৎ বিছানা-সুদ্ধ খাটখানা উলটে গেল। খাট-বিছানা সরিয়ে যখন তাকে বার করা হল, তখন তার দম প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। শেষ পর্যন্ত গঙ্গেশ গাঙ্গুলীর মুখের ওপর ছিটকে এসে পড়ল এক পচা ইঁদুর। সে ধাক্কা সামলে স্নান করে সবে মাত্র তিনি বসেছেন তাঁর বৈঠকখানায়, আর অমনি আইনের বই-ঠাসা মস্ত আলমারিটা গড়গড় করে এগিয়ে যেতে লাগল দরজার দিকে। হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলেন গাঙ্গুলী মশাই, নিজে নিজে গিয়ে দরজায় আটকে রইল আলমারিটা। ঘর থেকে বেরিয়ে পালাবেন তিনি, সে উপায়ও রইল না। তার পর আরম্ভ হল তুমুল কাণ্ড তাঁর চোখের সামনে, তাঁর বই কলম দলিল পত্র সমস্ত লণ্ডভণ্ড হতে লাগল। ঘরের ভেতরের প্রতিটি জিনিস কে বা কারা তাদের অদৃশ্য হাতগুলো দিয়ে তুলে ছিঁড়ে আছড়ে একেবারে শেষ করে ফেললে। ব্যাপার দেখে পরিত্রাহি চিৎকার করতে লাগলেন গাঙ্গুলী মশাই। পাড়ার মানুষ ভেঙে পড়ল তাঁর বৈঠকখানার দরজায়। সকলের সমবেত চেষ্টায় সেই জগদ্দল আলমারি যখন সরানো হল, তখন দেখা গেল গঙ্গেশ গাঙ্গুলী বেহুঁশ অবস্থায় পড়ে আছেন ঘরের মেঝেয়, আর ঘরের কাগজপত্র আয়না ছবি কোনও একটি জিনিস আস্ত নেই। ব্যাপার দেখে পাড়ার লোক তখন গাঙ্গুলী-বাড়ির ত্রিসীমানা মাড়ানো ত্যাগ করলে।

অবশেষে গাঙ্গুলী মশাই নুয়ে পড়লেন। সহধর্মিণীর দরজার তালা খুলে দিলেন। হাত জোড় করে বললেন—'তুমি যাও। আর কোনও দাবি নেই আমার তোমার ওপর। এখন দয়া করে তুমি আমায় রেহাই দাও। আমার বংশনাশটা আর করো না।"

জবাবও দিলেন না গাঙ্গুলী-গিন্নী। বুক পর্যন্ত ঘোমটা টেনে বেরিয়ে গেলেন বাড়ি থেকে। ছেলে মেয়ে নাতি নাতনী সবাই ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। পাড়া-পড়শী দল বেঁধে চলল তাঁর পিছু পিছু। সোজা গিয়ে উঠলেন তিনি পুলিস-ফাঁড়িতে। ততক্ষণে পুলিস সাহেব ছেড়ে দেবার হুকুম দিয়েছেন খাঁচায় বন্ধ জীবটিকে। অর্ধমৃত ছোকরাটির হাত ধরে চলতে শুরু করলেন গাঙ্গুলী-গিন্নী। থামলেন একেবারে স্টীমার ঘাটে পৌঁছে। যারা তাঁর পেছু নিয়েছিল, তারা জেনে এল যে চাটগাঁর দুখানা টিকিট কিনলেন তিনি আঁচল থেকে এক মুঠো টাকা বার করে। তার পর চাটগাঁ মেল গাঙ্গুলী-গিন্নী আর তাঁর একমাত্র সন্তানকে নিয়ে ভেসে চলে গেল।

ইতিহাস ঘুরে দাঁড়িয়ে মাত্র এক পা সামনে ফেললে। সঙ্গে সঙ্গে ঘটে গেল এক তাজ্জব কাণ্ড। মহকুমা আদালতের নামকরা উকিলের আড়াই-কুড়ি বছরের সহধর্মিণী কক্সবাজারের ছিয়ানব্বই বছর বয়স্ক নিকষকান্ত বকশী মশায়ের মৃত্যুশয্যা পার্শ্বে উপস্থিত হয়ে কবুল করলেন যে তিনি ফুল্লরা। যে ফুল্লরাকে বকশী মশাই স্বহস্তে পুড়িয়ে এসেছেন চৌষট্টি বছর আগে, যে ফুল্লরার এক মাত্র সন্তান অয়স্কান্তকেও তিনি পুড়িয়ে এসেছেন একদিন! সেই অয়স্কান্তকে নিয়ে তার মা ফুল্লরা ফিরে এলেন নিকষকান্ত বকশীর শেষ সময়ে।

নিকষকান্ত বকশী মশায়ের টনটনে হুঁশ ছিল তখনও। যাচাই করবার জন্যে জিজ্ঞাসা করলেন—"প্রমাণ? প্রমাণ দাও!"

প্রমাণ দিলেন ফুল্লরা, চৌষট্টি বছর আগে যে জিনিস হারিয়ে গিয়েছিল ফুল্লরাকে হারাবার সঙ্গে সঙ্গে, সে জিনিস সোজা গিয়ে বার করে আনলেন বকশী-বাড়ির মাটির তলা থেকে। যে সব কথা একমাত্র নিকষকান্ত আর তাঁর স্ত্রী ফুল্লরা জানতেন, সে সব কথা গুছিয়ে বললেন বকশী মশায়ের কানে কানে। তার পর ছেলের বাঁ হাতের বুড়ো আঙ্গুলটির ডান পাশের ছোট্ট আগুলটি দেখিয়ে যখন বললেন যে ছেলের বাপেরও বাঁ হাতের বুড়ো আঙ্গুলের ডানপাশে ছোট্ট একটি আঙ্গুল ছিল। সে আঙ্গুল খোয়া যাবার কারণটিও তিনি জানেন। সে কারণটি প্রকাশ করলে ছিয়ানব্বই বছর বয়সেও খুনের দায় থেকে রেহাই পাবেন না নিকষকান্ত বকশী, তখন বকশী মশাই স্ত্রী-পুত্রকে স্বীকার করে নিলেন। নতুন উইল বানালেন উকিলদের ডেকে। সেই উইলে তাঁর স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হল অয়স্কান্ত বকশী নামক একটি ছোকরা। আইনের মারপ্যাঁচ বাঁচাবার জন্যে ছোকরাটিকে যথাবিধি পোষ্যপুত্র নিতে হল। সব দিকের সমস্ত আঁটঘাট বেঁধে চোখ বুজলেন যখন নিকষকান্ত বকশী, তখন আরম্ভ হল একটি ছোকরার পরজন্ম। যে ছোকরাটি একদা তার দাদার হাত ধরে ইংরেজ রাণীর স্মৃতিসৌধ বানানো দেখতে যেত, যে ছোকরাটি একদা তার দাদা আর মাকে হারিয়ে বেওয়ারিস মাল হিসেবে পথের ধুলোয় গড়াগড়ি খাচ্ছিল, হঠাৎ তার বর্তমানটা গেল মুছে, অতীতের সঙ্গে ভবিষ্যৎ গেল জুড়ে। নতুন ইতিহাস গড়ে উঠতে লাগল।

ভবিষ্যতের বুকে অয়স্কান্ত বকশী সগৌরবে পদার্পণ করলেন কক্সবাজারে।

কক্সবাজারের বকশীরা।

কেউ জানে না কোথা থেকে কবে কোন বকশীর প্রথম শুভাগমন হয়েছিল কক্সবাজারে। নিকষকান্ত বকশী মশাই গোলদারী ব্যবসা চালাতে চালাতে কি

উপায়ে যে জাহাজ কিনে ফেললেন, তাও কেউ বলতে পারে না। একটা উপকথা চালু আছে ওদেশে। কবে নাকি এক টাইফুন না টর্নাডো উঠেছিল কক্সবাজারের দরিয়ায়। তার ফলে ভাঙা জাহাজের কাঠ ধরে ভেসে এসে কূলে ঠেকেছিল দু জন ভিন্-দেশী মানুষ। নিকষকান্ত বকশী তাদের উদ্ধার করেছিলেন দরিয়ার কূল থেকে, ঘরে নিয়ে গিয়ে আশ্রয় দিয়েছিলেন। তার পর একটু হিসেবের গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। সেই মানুষ দুটোকে আর খুঁজে পাওয়া যায় নি কোথাও। তার বদলে বকশী মশায়ের নিজের কেনা আস্ত একখানা জাহাজ একদা ঠিক সময় এসে কক্সবাজারের কূলে ভিড়েছিল।

তার পরের ঘটনাগুলো আর উপকথা নয়, জ্বলজ্যান্ত নির্জলা ইতিহাস। সেই জাহাজ মাল ভরতি হয়ে বার বার এল গেল কক্সবাজার থেকে। নিকষকান্ত বকশী মশাই কক্সবাজারের হিসেবের খাতায় জমার ঘরে হাতের লেখা মকশ করতে লাগলেন। তার পর থেকে আর কোথাও এক আঁচড় গোলমাল নেই হিসেবের।

সেই হিসেবের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে অয়স্কান্ত যেদিন আসীন হলেন বকশীদের রাজপাটে, সেদিন বুঝতে পারেন নি তিনি যে, নেপথ্য থেকে সুতো টানাটানি করে যে জাদুকর তাঁর পূর্বজন্মটাকে পরজন্মের সঙ্গে সংযুক্ত করে দিলে, সেই জাদুকরের গোলামি করতে হবে তাঁকে আমরণ। সে গোলামিতে হার্দিক হ্যাংলাপনার গোস্তাকি চলবে না। অয়স্কান্ত আকর্ষণ করতে পারবেন না কিছুই, বিকর্ষণের বিক্ষুব্ধ ঘূর্ণিতে পাক খেতে খেতে হৃদয়টিই তাঁর রসকষহীন ছিবড়েয় পরিণত হবে।

অয়স্কান্ত-জননী দেহরক্ষা করলেন যথাসময়ে।

দেহটি রক্ষা করলেন তিনি এক পাল হন্যে কুকুরের উদর-গহ্বরে।

ছেলে নিয়ে নিকষকান্তর বাড়িতে উদয়ের পরেই একটা দুটো করে এক পাল কুকুর জমা হল বকশী-বাড়িতে। একটিকেও তিনি তাড়াতে দিলেন না, সব কটিকে সন্তানাধিক যত্নে পালন করতে লাগলেন। প্রথম দিকে তাদের ভাত ডালই খাওয়াতেন, তার পর হঠাৎ তাঁর খেয়াল হল কুকুরদের মাংস খাওয়াবার। কাঁচা মাংস। আস্ত একটা খাসি কেটে টুকরো-করা মাংসগুলো তাঁর নজরের সামনে কুকুরদের খাওয়াতে হত। কুকুরদের বংশবৃদ্ধি, মাংসের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়ে চলল সমানে। একটা খাসির জায়গায়—দুটো কাটা হতে লাগল। তার পর বীভৎস এক রেওয়াজ চালু করলেন তিনি। জ্যান্ত দুটো ছাগল ধরে দিতে হবে কুকুরদের মুখে। কুকুররা জ্যান্ত ছাগলের শরীর থেকে মাংস খাবলে খাবে। সেই পৈশাচিক কাণ্ড ঘটাবার জন্যে খুব উঁচু পাঁচিল তুলে একটা জায়গা ঘিরে ফেলা হল বাড়ির পেছনে বাগানের মধ্যে। এই খেয়ালটিতে বাধা দিতে গিয়েছিলে-,

পুত্র অয়স্কান্ত, ফল হয় নি কিছুই। পর পর কয়েকটা রাত অয়স্কান্ত জননী ছাতের ওপর কাটালেন, অনর্গল অবোধ্য ভাষায় চিৎকার করে কাদের যেন গাল-মন্দ দিলেন। দিনগুলোয় বেহুঁশ অবস্থায় মুখ গুঁজড়ে পড়ে রইলেন। অবস্থা দেখে অয়স্কান্তের খেয়াল হল নাগিনী মহাশয়ার কথা। তিনি আর বাধা দিলেন না, কুকুরদের জ্যান্ত ছাগল খাওয়ানো নির্বিঘ্নে চলতে লাগল।

জ্যান্ত ছাগল জ্যান্ত কুকুরদের খাওয়ানো ছাড়া অন্য কোনও রকম অস্বাভাবিক কাণ্ড করতেন না ফুল্লরা কখনও। চুপচাপ নিজের ঘরে দরজায় খিল এঁটে থাকতেন। সন্ধ্যার আগে একটিবার মাত্র ঘরের দরজা খুলে বেরতেন। কখনও স্নান করতেন না তিনি, জলস্পর্শ করতেন না এ কথা বললেও অন্যায় বলা হবে না।

কুকুরদের ভোজন দর্শন করে নিজে সামান্য কিছু ফল-টল খেয়ে আবার ঘরে গিয়ে ঢুকতেন।

তার পর আর কারও সঙ্গে কোনও সম্বন্ধই রাখতেন না।

বকশী-বাড়ির আবহাওয়া বেশ ঠাণ্ডা রইল কয়েক বছর। যথাবিহিত বকশী কোম্পানির ব্যবসা-বাণিজ্য চলতে লাগল। কর্মচারীরা নতুন মনিবকে কাজকর্ম শেখাতে লাগল যত্ন করে। না শিখিয়ে উপায়ও ছিল না। কর্মচারীদের মধ্যে কেউ কোনও রকমের চালাকি চালাতে গেলে বাড়ির কর্ত্রী বন্ধ ঘরের ভেতর থেকে তা টের পেতেন। তখন কর্মচারীটিকে ডেকে সাবধান করে দিতেন মাত্র এক বার। তাতেও কোনও ফল না ফললে শুরু হত অত্যাচার। সে অত্যাচারের কোনও বাঁধাধরা নিয়ম ছিল না। নিত্য নতুন উৎপাত ঘটত তার সংসারে। কর্মচারীটির ছেলে মেয়ে বউ থাকলে তারা ভয়ঙ্কর সব দুঃস্বপ্ন দেখত, কারও বা হাত-পা ভাঙত, কারও ঘরের মটকা উপড়ে উড়ে চলে যেত বিনা ঝড়ে। তখন সে সাবধান হত বা চাকরির মায়া পরিত্যাগ করে পালাত। এ হেন অপার্থিব অনুশাসনের তলায় বকশী-বাড়ির হিসাব-নিকাশের খাতায় কিছুমাত্র তঞ্চকতা ঘটবার সুযোগ ঘটল না।

আর এক দিকের হিসাব কিন্তু বাড়তেই লাগল। অয়স্কান্ত স্বয়ং বিশের কোঠা ছাড়িয়ে ত্রিশের কোঠায় গিয়ে পৌঁছলেন। উঁচু দরের সাজপোশাক, খানা-পিনা, উঁচু দরের চালচলন আর অবিশ্রান্ত চারিদিক থেকে মাথা নত করা সেলাম অয়স্কান্তর জেল্লা অদ্ভুত রকম বাড়িয়ে দিলে। পূর্বজন্ম, পূর্বজন্মের পূর্ব-জন্ম, সব মিলিয়ে গেল ধোঁয়াটে যবনিকার অন্তরালে। কোনও কিছু অভাব না থাকার অভাব বোধটি ধুঁইয়ে উঠতে লাগল তাঁর ভেতরে। নিজের বুকের মধ্যে কেমন যেন একটা নতুন জাতের ফোঁসফোঁসানি শুনতে লাগলেন। তখন তাঁর চোখে ঘর বাড়ি আকাশ-বাতাস সব কিছুর রঙ পালটে যেতে লাগল। তার পর একদা সেই রঙ রূপ পরিগ্রহ করলে। বর্মা মুলুকের বনেদী ব্যবসাদার মাধোরাম

মুনসীর সঙ্গে বকশীদের ব্যবসাদারী সম্বন্ধ ছিল বহু দিনের। মাধোরাম তাঁর একমাত্র কন্যার বিবাহ দিয়ে কন্যা-জামাতাকে জাহাজ ভাড়া করে মধুচন্দ্র যাপন করবার জন্যে সমুদ্রের বুকে ভাসিয়ে দিলেন। জাহাজখানি ছিল কক্সবাজারের বকশী কোম্পানির। বকশীদের তিনি জানিয়েও দিলেন, যে তাঁর মেয়ে-জামাই কক্সবাজার জায়গাটা দেখবার জন্যে গেলেও যেতে পারে।

তারা এল।

একদা যথোপযুক্ত সাজপোশাক পরে লোকলস্কর সঙ্গে নিয়ে অয়স্কান্তকে যেতে হল জাহাজঘাটে মাধোরাম মুনসীর মেয়ে-জামাইকে সাড়ম্বরে অভ্যর্থনা করবার জন্যে। জাহাজ ভিড়ল ঘাটে, নামলেন মাধোরামের জামাই-মেয়ে। বনেদী কারবারের নতুন মালিক অয়স্কান্ত বকশী আর তাঁর বড় বড় কর্মচারীরা সুপরিকল্পিত সৌজন্য সহকারে তাঁদের নামিয়ে নিয়ে গেলেন। সকলের নজর এড়িয়ে অয়স্কান্ত বকশী একটিবার মাত্র তাঁর নিজের বুকখানার মধ্যে উঁকি দিতে গিয়ে দেখলেন, অদ্ভুত এক ব্যাপার ঘটে গেছে সেখানে। যে নতুন জাতের অর্থহীন ফোঁসফোঁসানি শুনতে পাচ্ছিলেন তিনি তাঁর বুকের মধ্যে, হঠাৎ সেটা স্তব্ধ হয়ে গেছে। তার বদলে সেখানে জ্বলছে, অনুপম স্নিগ্ধ একটি জ্যোতি। সেই জ্যোতিটুকু নিয়ে এলেন মাধোরাম মুনসীর সদ্য বিবাহিতা কন্যা তাঁর দুই আঁখিতে ভরে বর্মা মুলুক থেকে। অনুপম সেই জ্যোতির ছোঁয়াচ লেগে অয়স্কান্তর বুকের মধ্যে ঠিক সেই জাতের এক জোতি জ্বলে উঠল। অয়স্কান্ত নিভৃতে নিজেকে নিজে শুনিয়ে দিলেন যে ঐ মেয়ের নাম অনুপমা।

॥ তিন ॥

অনুপমা।

অনুপমা হল একটি চিন্তার নাম। একদা আচম্বিতে ঐ নামটি জন্ম নিলে অয়স্কান্তের মনের মধ্যে। একান্ত সংগোপনে মনগড়া নামটিকে তিনি পুষতে লাগলেন তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে। অদ্ভুত এক রহস্যময় জগতের দরজা খুলে গেল অয়স্কান্তের জন্যে, দরজাটি শুধু তাঁর জন্যেই খুলল। চুপি চুপি চোরের মত তিনি ঢুকলেন সেই জগতে, দুরু দুরু বুকে ঘুরতে লাগলেন সেখানকার আলো-আঁধারি অলিতে গলিতে। পালিয়ে আসার জন্যে আঁকুপাঁকু করতে লাগল তাঁর প্রাণ, পথ খুঁজে পেলেন না তিনি কোনও দিকে। অনুময় সেই জগতে একা, একেবারে নিঃসঙ্গ নিঃসম্বল অয়স্কান্ত বকশী নিজেকে নিজে হারিয়ে ফেললেন। প্রায় দেড় কুড়ি বছর অর্থহীন বাঁচা বাঁচবার পরে বেঁচে থাকার মানে খুঁজে পেলেন অয়স্কান্ত। নিজেকে হারিয়ে নিজের চিন্তার মধ্যে তিনি বেঁচে রইলেন।

সভ্য মানুষ সভ্য ভাষায় ঐ অবস্থাটার নাম দেবে বোধ হয় প্রেমে পড়া

অবস্থা। হয়তো তা হবেও, সত্যিই হয়তো প্রেমেই পড়ে গিয়েছিলেন অয়স্কান্ত মাধোরাম মুন্সীর সদ্য-বিবাহিতা কন্যাটির। কিন্তু ঠিক সেই সময় তিনি সত্যিই বুঝতে পারেন নি কি ঘটল তাঁর জীবনে। প্রেম ব্যাপারটা যে কি, ওই ব্যাধিটার আক্রমণে কি হাল হয় মানুষের, এই সমস্ত ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার তার আগে কখনও সুযোগ ঘটে নি তাঁর। বেশ কিছুকাল কেটে গেল টের পেতে যে অনুর চিন্তা ছাড়া অন্য কোনও চিন্তা তিনি করেনই না দিবারাত্র অষ্টপ্রহরের মধ্যে। সে চিন্তাটায় চাওয়া-ছোঁওয়ার এক ফোঁটা ভেজাল ছিল না, এমন কি অনুকে চোখের দেখা দেখবার জন্যেও বিন্দুমাত্র আকুলি-বিকুলি ছিল না। ছিল শুধু অনু নামটিকে অবিরাম মনে মনে জপ করা। ঐ জপ নিয়েই এমন ভাবে মেতে উঠলেন তিনি যে অনুর সাকার রূপটিও বোধ হয় বেমালুম ভুলে মেরে দিলেন।

বাইরে তাঁর চালচলন ব্যবহারে এক চুল এধার ওধার হল না। বকশী কোম্পানির নতুন মালিকের মাপ-জোখ করা ভয়ঙ্কর কেতাদুরস্ত চালের চাপে মাধোরাম মুন্সীর কন্যাজামাতা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। খানদানী আদবকায়দার শ্বেত-শুভ্র পর্দায় ছিটেফোঁটা আন্তরিকতার ছোপ পড়ল না। জাঁকজমকের জাঁতার পেষণে তাঁদের সদ্যবিবাহিত জীবনের রসটুকু নিঃশেষে নিংড়ে বেরিয়ে যেতে লাগল।

ছিবড়ে হয়ে গেল আতিথেয়তার অম্লান আতিশয্য, মহাসম্ভ্রান্ত অতিথিরা পালাই পালাই ডাক ছাড়তে লাগলেন। নিখুঁত ভদ্রতার নির্মম নির্যাতন সইতে সইতে তাঁদের ধারণা হয়ে গেল, অয়স্কান্ত নামক জীবটির শরীরে আর যাই থাক রক্ত মাংস চামড়া বলতে যা বোঝায় সে সমস্ত কোনও কিছুর বালাই নেই। দেহাতীত একটা কিছু বলেই ধরে নিলেন তাঁরা—বকশী কোম্পানির মালিককে। নিয়ে আবার জাহাজে ওঠার তোড়জোড় করতে লাগলেন।

বাগড়া দেবার কিছুমাত্র চেষ্টা করলেন না অয়স্কান্ত। অনু চলে গেলে যে মস্ত একটা লোকসান হবে, এ বোধটুকুও তাঁর মনের কোণে উদয় হয় নি। মহাড়ম্বরে বিদায় দেবার খুঁটিনাটি ব্যবস্থাগুলো নিয়ে তিনি হিমশিম খেতে লাগলেন তাঁর কর্মচারীদের সঙ্গে। বিদায় কথাটির সঙ্গে ব্যথা কথাটির কোথাও কোনও খানে কিছুমাত্র সম্বন্ধ নেই, এই নিছক সত্যটা অতিথিদের চোখে নির্মম ভাবে ধরা পড়ে গেল। জাহাজ ছাড়বার আগের সন্ধ্যায় বিদায়-উৎসবের চোখ-জ্বালা-করা জলুস দেখে তাঁরা মর্মে মর্মে বুঝলেন যে হিসেব-হীন অর্থের অপচয় করা কাকে বলে। এও বুঝলেন যে অয়স্কান্ত বকশীর সঙ্গে জাঁকজমকের টেক্কা দেওয়ার চেষ্টা করাটা কত বড় পাগলামি করা হবে। বুঝে তাঁরা শেষ রাতের মত বকশী-বাড়িতে ঘুমোতে গেলেন।

বাগড়া কিন্তু পড়ল।

পরদিন সকালে অতিথিদের জাহাজে চড়া আর ঘটে উঠল না। বকশী-বাড়ির নিভৃত অন্দরমহলের অন্তরালে কত বড় অমানুষিক অভিশাপ লুকিয়ে আছে, তা জেনে ফেললেন তাঁরা। জেনে ফেলা নয় শুধু, অচিন্তনীয় এক পৈশাচিক দৃশ্য দেখলেন তাঁরা। চোখ মেলে, দেখে ভয়ে বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেলেন। অর্ধেক রাতে স্বয়ং অয়স্কান্ত বকশীও আবার এক বার ফিরে যেতে বাধ্য হলেন তাঁর পার-হয়ে-আসা ইতিহাসের জঠরগহ্বরে।

অয়স্কান্ত-জননী ফুল্লরা হঠাৎ আবার গঙ্গেশ গাঙ্গুলী উকিলের স্ত্রী ফুল্লনলিনী হয়ে গেলেন সামান্যক্ষণের জন্যে। কি উদ্দেশ্যে যে তিনি অর্ধেক রাতে তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে কুকুরদের জন্যে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা জায়গাটার ফটক খুলে তার মধ্যে ঢুকে পড়েছিলেন, তা কেউ বলতে পারে না। নিষুতি রাতে মর্মভেদী আর্তনাদে কক্সবাজারের কালো আকাশ চিরে খান খান হয়ে গেল। রাশি রাশি মানুষ ঘুম থেকে জেগে উঠে পড়ি তো মরি করে গিয়ে জমা হল বকশী-বাড়ির বন্ধ গেটের সামনে। গেটের ভেতরের মানুষগুলো গিয়ে ঢুকল কুকুরদের আস্তানায়। জ্যান্ত-ছাগল-খেকো ডালকুত্তাদের সমবেত হুহুঙ্কার আর তার সঙ্গে মেশানো মানুষের অন্তিম আকুতি সবাইকে পঙ্গু করে ফেললে কিছুক্ষণের জন্যে। এল আলো এল লাঠি ঠেঙা অস্ত্রশস্ত্র, দেখে শিউরে উঠল সবাই কি ঘটছে সেখানে। পড়ে আছেন বকশী-বাড়ির কর্ত্রী, তাঁর বুকের ওপর চড়ে আছে একটা ডালকুত্তা, গলাটা ছিঁড়ে সে তাজা রক্ত চাটছে। আরও কয়েকটা কুকুরে কর্ত্রীর হাত পা থেকে মাংস ছিঁড়ে নিচ্ছে।

কারও মুখ থেকে কোনও কথা বেরোবার আগে মাধোরাম মুন্সীর জামাই ঝাঁপিয়ে পড়লেন কুকুরদের মাঝখানে। শুধু হাত আর পা চালিয়ে চক্ষের নিমেষে তিনি কুকুরগুলোকে ছিটকে ফেললেন তফাতে। তখন সকলে এগিয়ে গিয়ে উঠিয়ে আনলে খাবলে-খাওয়া শরীরটাকে। মাধোরাম মুন্সীর কন্যা তৎক্ষণাৎ লেগে গেলেন শরীরের মধ্যে প্রাণটুকু টিকিয়ে রাখার চেষ্টায়। এক কোণে পাথরের মূর্তির মত বসে রইলেন অয়স্কান্ত বকশী। ডাক্তার বদ্যি এল, পুলিশ পেয়াদা এল। এল এবং যার যা করবার করে চলে গেল। বকশী-বাড়ির মালিক কারও দিকে ফিরেও তাকালেন না। তাঁর দিকেও কেউ নজর দিলে না। জানতেও পারলেন না অয়স্কান্ত, শেষ নিশ্বাস ফেলবার আগে জড়িয়ে জড়িয়ে কি কাহিনী বলে গেলেন গঙ্গেশ গাঙ্গুলী উকিলের স্ত্রী। বলে গেলেন কাউকে উদ্দেশ না করেই, কিন্তু তার সবটুকু শুনে নিলে মন দিয়ে মাধোরাম মুন্সীর মেয়ে। শুনে তখনকার মত কথাগুলোকে সে গিলে রাখলে। যথোচিত আড়ম্বরের সঙ্গে কুকুরের উচ্ছিষ্ট দেহটা শ্বেতচন্দনের চিতায় চড়ে ভস্মে পরিণত হল।

বকশী-বাড়ির আভিজাত্য আদবকায়দা মান ইজ্জত ঠাট ঠমক সবই এক সঙ্গে এক চিতায় ভস্ম হয়ে গেল বাড়ির কর্ত্রীর সঙ্গে। সেই ভস্মরাশির ভেতর নতুন এক তত্ত্ব খুঁজে পেলেন অয়স্কান্ত। জানতে পারলেন তিনি, বেঁচে থাকতে হলে একটা কিছু আঁকড়ে ধরে বাঁচতে হয়। একটু চোখের জল, সামান্য একটু সহানুভূতি, মনের বোঝাটা হালকা করার উপযুক্ত আর একখানি মন, উত্তপ্ত কপালে বুলিয়ে দেবার মত একখানি হাত—বা শুধু একটু ব্যথাভরা চাউনি, এই তুচ্ছ জিনিসগুলোর মূল্য বুঝতে শিখলেন অয়স্কান্ত। বুকের ভেতরটা কেমন যেন খালি খালি মনে হতে লাগল। পথের কুকুরের মত যখন ঘুরে বেড়াতেন পথে পথে, তখন তিনি জানতেন না যে, কত অসহায় কি ভয়ানক রকম নিঃসঙ্গ তিনি। বকশী-বাড়ি-ভরতি চাকরবাকর পেয়াদা কর্মচারীর মাঝে বসে বাড়ির মালিক অয়স্কান্ত বকশী নিজের দিকে তাকিয়ে ভয়ে কাঁপতে লাগলেন। অন্ধকার রাতে গভীর জঙ্গলের মাঝে একেবারে একলা পথ হারিয়ে ফেলেছেন যেন, অন্ধকারের ভেতর থেকে হিংস্র প্রাণীরা যেন তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। তাদের জিভ লকলক করছে, নিমেষের মধ্যে তাঁর ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবার জন্যে ওৎ পেতে রয়েছে।

মালিকের মনের সেই ভয়ঙ্কর অবস্থার মধ্যেও চলতে লাগল দুর্জয় রকমের শ্রাদ্ধশান্তির ঘটা। দেশ-দেশান্তর থেকে বড় বড় ব্যবসাদাররা জাহাজ ভরতি হয়ে এসে পেঁৗছলেন কক্সবাজারে। স্বয়ং মাধোরাম মুন্সী এসে গেলেন। মেয়েজামাই তো তাঁর ছিলই আগে থেকে বকশী-বাড়িতে। সবাই মিলে মহামহোৎসব সমাধা করে ফেললেন। দান দান আর দান। বিধবা-আশ্রম সধবা-আশ্রম স্কুল-কলেজ হাসপাতালে রাশি রাশি টাকার চেক চলে গেল। তীর্থে তীর্থে লোক পাঠিয়ে সাধু সন্ন্যাসী ভিখিরী আতুরদের জন্যে ধর্মশালা অন্নসত্র খোলা হতে লাগল। অফুরন্ত অর্থ কক্সবাজারের মাটি ছেড়ে ভেসে গেল দরিয়ায়। আর্তি প্রার্থী এক প্রাণী বিমুখ হল না। আকাশ-বাতাশ কেঁপে উঠল বকশী-কোম্পানির নতুন মালিকের জয়ধ্বনিতে। তার পর একদা নিস্তব্ধ হয়ে গেল বকশী-বাড়ি। যে পথে যাঁরা এসেছিলেন উৎসব করতে, সেই পথ দিয়ে তাঁরা ফিরে গেলেন উৎসব শেষ করে। ঘাটে দাঁড়িয়ে অয়স্কান্ত একে একে সবাইকে বিদায় দিলেন পরম পরিতুষ্টি মুখে মেখে। সব শেষে মাধোরাম মুন্সীর মেয়ে-জামাইকে বিদায় দেবার ক্ষণটি এগিয়ে এল। মুন্সী আগেই উঠে গেলেন জাহাজে, তাঁর জামাইও উঠল তাঁর পেছনে। মেয়ে পিছিয়ে পড়ল। সামান্য কয়েকটি মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল ঘাটে অয়স্কান্তের পাশটিতে। সেই ফাঁকে কয়েকবার অদ্ভুত ভাবে চাইলে সে অয়স্কান্তের মুখের দিকে, অল্প একটু নড়ে উঠল তার ঠোঁট দুখানি। অয়স্কান্ত শুনতে পেলেন—"চলুন না আমাদের সঙ্গে!"

হঠাৎ এই অদ্ভুত প্রস্তাব শুনে কেমন যেন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলেন অয়স্কান্ত। চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি। দেখলেন, কালো তারা দুটি জলে ডুবে গেছে। কি বলা উচিত, ঠিক করতে পারলেন না। মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল—"কোথায়?"

কোথায় যেতে হবে, জানতে চাইলেন অয়স্কান্ত। জানতে চেয়ে জবাব পেলেন না। তার বদলে শুনলেন—"কি করে একলা থাকবেন এখানে আপনি?"

এ প্রশ্নের জবাবও দিতে পারলেন না অয়স্কান্ত বকশী। জাহাজের ভোঁ বেজে উঠল। মুন্সী-কন্যা দ্রুতপদে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল।

কক্সবাজারের কূলে দাঁড়িয়ে মাথা নীচু করে অয়স্কান্ত ভাবতে লাগলেন, কি করে একলা দিনরাতগুলো কাটাবেন তিনি বকশী-বাড়িতে।

দিন রাত কাটেই, ওরা দু জনে হাত ধরাধরি করে নিজেদের আইনে নিজেরা চলে। অয়স্কান্ত বকশীর মুখ চেয়ে দিনরাতগুলো বসে রইল না, অয়স্কান্ত স্বয়ং বসে রইলেন দিনরাতের মুখের দিকে তাকিয়ে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে একটা চাপা আক্রোশ ফুঁসিয়ে উঠল তাঁর বুকের মধ্যে। নিঃসঙ্গতার বিষে বিষিয়ে উঠল তাঁর মন। কিছুতেই তিনি ধরতে পারলেন না, কার ওপর রেগে যাচ্ছেন। এমন কাউকে খুঁজেই পেলেন না ত্রিভুবনে, যার ওপর তিনি রাগতে পারেন, অভিমান করতে পারেন, যার কাছে ছোটখাটো কিছু দাবি আবদার চালাতে পারেন। এই ভয়ঙ্কর অসহায় অবস্থাটা থেকে মুক্তি পাওয়ার পথ খুঁজতে লাগলেন। হঠাৎ তাঁর মাথায় একটা অদ্ভুত মতলব গজিয়ে উঠল। উল্লাসে উত্তেজনায় শরীরের রক্তে তোলপাড় লেগে গেল। তৎক্ষণাৎ লোকজনদের ডেকে জেনে নিলেন, কুকুরগুলোকে কি খাওয়ানো হচ্ছে। তখনও সমানে জ্যান্ত ছাগল খাওয়ানো হচ্ছে শুনে খেপে গেলেন। কড়া হুকুম জারি করলেন, এক গণ্ডূষ জল বা এক টুকরো মাংসও যেন না দেওয়া হয় কুকুরদের। যে ফটক দিয়ে কুকুরদের আস্তানায় যাওয়া-আসা যেত, সে ফটকের চাবি নিজের কাছে রেখে দিলেন। দিয়ে এক রকম দম আটকানো অবস্থায় অপেক্ষা করে রইলেন।

প্রথম দিন বিশেষ কিছু হল না। খাওয়ার সময় পার হবার পরে গভীর গর্জনে আকাশ-বাতাস ফাটাতে লাগল তারা। দ্বিতীয় দিনে নিজেরা কামড়া-কামড়ি শুরু করলে। তৃতীয় দিনে তাদের গলার জোর কমে এল। তার পরের দিন মর-মর একটা বাচ্চাকে ছিঁড়ে খুঁড়ে খেয়ে ফেললে। সংবাদটা পেয়ে ফটকের বাইরে চেয়ার পেতে বসলেন গিয়ে অয়স্কান্ত। বসে মহা আরামে দেখতে লাগলেন কুকুরদের দুর্দশা। আধ-হাত জিভ বেরিয়ে পড়েছে তখন তাদের, পিঠে পেটে এক হয়ে মিশে গেছে। গেটের ওধারে জড়ো হয়ে জিভ বার

করে সকলে ধুঁকতে লাগল অয়স্কান্তের মুখের দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে।

বসে রইলেন অয়স্কান্ত বকশী, এক বিন্দু জল নিজেও গলা দিয়ে নামালেন না। ঠায় এক ভাবে তাকিয়ে রইলেন কুকুরগুলোর দিকে। তিন দিন তিন রাত সমানে এক জায়গায় এক ভাবে বসে রইলেন। একে একে কুকুর-গুলো ধুঁকতে ধুঁকতে মলো তাঁর চোখের সামনে। দেখে পরম পরিতৃপ্তিতে নিজের ঠোঁট চাটতে লাগলেন। নতুন জাতের একটা রসের আস্বাদ পেলেন গলার মধ্যে, খুব কড়া খুব গাঢ় খুবই ঝাঁঝাল রসটা। উৎকট নেশা ধরে গেল তাঁর। সুযোগ খুঁজতে লাগলেন আর এক বার ঐ জাতের রস পান করবার। দেরি হল না সুযোগ মিলতে। এবার আর কুকুর নয়, কুকুরের চেয়ে ঢের বড় জানোয়ার, জানোয়ারটির নাম মানুষ।

বকশী-বাড়ির ডালকুত্তাগুলো মরেছে জানতে পেরে চোর ঢুকল এক রাতে। ঢুকল বটে কিন্তু বেরিয়ে আসতে পারলে না। সারা রাত অন্ধ হয়ে বাড়িময় ঘুরে বেড়াতে লাগল। ধরা পড়ল পরদিন সকালে। বাড়ির মালিকের সামনে নিয়ে যাওয়া হল তাকে। দেখে মালিকের জিভে জল এসে গেল। বার-কতক নিজের ঠোঁট চেটে হুকুম দিলেন তিনি,—চোরটাকে ঘরে বন্ধ করে রাখবার জন্যে। রাত্রে তার বিচার হবে।

সারা রাত ধরে বিচার হল। বিচারের সময় বিচারক আর আসামী, এই দু জন ছাড়া আর কেউ থাকতে পেল না সেই ঘরে। ঘরের বাইরে যারা রইল, তাদের বুকের ভেতর মোচড় দিতে লাগল হতভাগা চোরটার অতি অস্বা-ভাবিক গোঙানি শুনে। সমস্ত বকশী-বাড়ি চোরটার সঙ্গে ককিয়ে ককিয়ে কাঁদল রাত ভোর। পর দিন ভোরে বিচারক আর চোর দু জনেই বেরিয়ে এল ঘর থেকে। দেখে লোকে শিউরে উঠল, চোরটা বদ্ধ পাগল হয়ে গেছে। আর বিচারকের চোখে মুখে সর্বদেহে একটা অপার্থিব আনন্দের ঢেউ খেলে যাচ্ছে।

তার পর বকশী-বাড়ি থেকে চাকরবাকর পালাতে শুরু করলে। কর্মচারীরা যত দূর সম্ভব মালিককে এড়িয়ে চলতে লাগল। অয়স্কান্ত তখন মগদের ভেতর থেকে বেছে বেছে চাকর রাখলেন নিজের জন্যে। ক্রমে তিনি নিজেকে সরিয়ে নিলেন সকলের নজরের আড়ালে। নিজস্ব কয়েকটি চাকর ছাড়া আর কারও অধিকার রইল না তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার। কি নিয়ে যে তিনি জীবন কাটান, তাও কারও জানার উপায় রইল না। বাইরে শুধু একটি মাত্র পরিচয়ই বেঁচে রইল তাঁর। লোকে জানল, তাঁর মত নিষ্ঠুর মানুষ দুনিয়ায় দুটি নেই। লোকচক্ষুর অন্তরালে বসে অয়স্কান্ত বকশী নামের নরপিশাচ নিত্য নতুন ফন্দিফিকির বার করছেন মাথা ঘামিয়ে, আর নিজের বিশ্বস্ত অনুচরদের জঙ্গলে পাঠিয়ে বনের জন্তু-জানোয়ারদের ধরে আনিয়ে তাদের ওপর নিষ্ঠুরতার

পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে পৈশাচিক আনন্দ উপভোগ করছেন।

মহাশান্তিতে ঐ নিষ্ঠুরতা সম্বল করে কেটে যেত হয়তো অয়স্কান্তের জীবন, সে সুখেও বাধা পড়ল। ফিরে এলেন মাধোরাম মুন্সীর কন্যা-জামাতা আবার কক্সবাজারে, সঙ্গে নিয়ে এলেন এক বনলতা। হ্যাঁ, বনলতার মতই তাকে দেখতে ছিল। বনলতার মত শ্যামল চিকন তন্বী, বনলতার মত রহস্যময় জটিল রেখায় ভরা ছিল তার দেহবল্লরী। সেই বনলতা অরণ্যের নিবিড়তা নিয়ে এল বকশী-বাড়িতে, নিয়ে এল আরণ্যক শান্তি, আরণ্যক অরাজকতা। বকশী-বাড়ির পারলৌকিক আবহাওয়াটাকে বন্য উল্লাসে তছনছ করে ছেড়ে দিল সে। অয়স্কান্ত হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। অর্থহীন হাসি-গান হৈ-হুল্লোড়ে মেতে উঠলেন তিনি। ভুলে গেলেন নিজের অতীতকে, বর্তমানকেও ভুলে গেলেন। কোমরে আঁচল জড়িয়ে খামকা ছুটে বেড়াতে লাগল বনলতা তাঁর চোখের সামনে দিয়ে। খামকা তাঁর সঙ্গে খুনসুড়ি বাধিয়ে ঠোঁট ফুলিয়ে মুখ গোঁজ করে বসে রইল। আবার পর মুহূর্তেই অনর্থক এমন বেহিসেবী হাসি হাসতে শুরু করে দিল যে তা দেখে অয়স্কান্তর মনে পড়ে গেল একটা পাহাড়ী ঝর্নাকে। জঙ্গলে জ্যান্ত পশু ধরবার আশায় সেই ঝর্নাটার ধারে লুকিয়ে বসে থাকতেন তিনি। নির্জন অরণ্যের মাঝে সেই ঝর্নার সুর তাঁর বুকের রক্তে দোলা লাগাতে পারে নি, কারণ ব্যাধের চোখ কান নিয়ে বসতেন সেই ঝর্নার ধারে। বকশী-বাড়ির সর্বত্র সেই ঝর্নার সুর যখন খেলা করতে লাগল তখন নতুন কান দিয়ে তিনি তা শুনলেন। শুনতে শুনতে নতুন মানুষ হয়ে গেলেন একেবারে। মৃত্যু-যন্ত্রণার মর্মান্তিক আর্তনাদের বদলে বেঁচে থাকার বরাভয় মন্ত্র শুনতে লাগলেন অবিরাম। জীবনের ওপর মোহ জন্মে গেল, জীবনকে ভালবাসতে শিখলেন।

॥ চার ॥

জীবনকে ভালবাসা আর জীবন-রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্যে হন্যে হয়ে ওঠা এক কথা নয়। মাধোরাম মুন্সীর জামাতা বাবাজী জীবনের ছাল চামড়া ছাড়িয়ে তার মধ্যে কি বস্তু আছে, তা জানবার বাসনায় নিজের জীবনটাকে উৎসর্গ করে ফেলেছিলেন। ডাক্তার ধূর্জটিনাথ চৌধুরী ত্রিশের কোঠায় পৌঁছবার পূর্বেই অনেকগুলো ভারী ভারী উপাধি অর্জন করেছিলেন, প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের অনেকগুলো জায়গা ঘুরে এসেছিলেন। কয়েকটা চা-বাগান ছিল চৌধুরীদের, সে জন্যে অর্জিত উপাধিগুলোকে উপার্জনের কাজে লাগাতে হয় নি। উপার্জন করে জীবন-ধারণের প্রয়োজন যার না থাকে, সে অনায়াসে যে কোনও জাতের রহস্যের পেছনে ধাওয়া করতে পারে। ধূর্জটিনাথ ফিরে এলেন তাই কক্স-

বাজারে, সঙ্গে আনলেন স্ত্রীটিকে আর বনলতাকে। বনলতার পরিচয় দিলেন পিসতুতো বোন বলে। পিসতুতো বোন মামাতো দাদা আর দাদার বৌয়ের সঙ্গে দেশভ্রমণে এল, এতে আর কার কি বলবার আছে!

কেউ কিছু বলতেই বা যাবে কেন!

তবে সবাই দু চোখ মেলে দেখতে লাগল। দেখল, বকশী-বাড়ির আদব-কায়দার দুর্ভেদ্য দেওয়ালে অনেকগুলো বড় বড় চিড় খেয়েছে। সেই সমস্ত চিড়ের ভেতর দিয়ে বকশী-বাড়ির মালিককে মানুষ বলে চেনা যাচ্ছে। লোকটা হাসতে জানে, হাসাতে জানে, সেধে সকলের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করে, সব থেকে আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে মানুষের দুঃখ কষ্ট পর্যন্ত বোঝে। একটা নতুন অয়স্কান্তকে নতুন করে চিনতে লাগল কক্সবাজারের মানুষে। জানতে পারল, অয়স্কান্ত বকশী সামান্য একটা মেয়েমানুষকে খুশী করার জন্যে কি ভাবেই না বদলে যেতে পারে।

হাঁ, অয়স্কান্ত বকশী বদলেই গিয়েছিলেন। সেই বনলতার তীব্র মাদকতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন তিনি, বুঝতে পেরেছিলেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডখানা খুব ছোট জায়গা নয়। বিশ্বে বকশী-বাড়ি আর বকশী-বাড়ির অয়স্কান্ত বকশী ছাড়াও এমন অনেক বস্তু আছে যা নিয়ে মাথা ঘামানো যায় হাসা যায় কাঁদা যায়। ঝড় বৃষ্টি আগুন লাগা ইত্যাদি ব্যাপারগুলোও কি কম মজার কান্ড, বছরের পর বছর কক্সবাজারে তুফান আর আগুন কত মানুষের সর্বনাশ করে ছাড়ে, ছারখার হয়ে যায় কত সাজানো সংসার। সেই ছারখারের সঙ্গে লড়াই করে আবার সমস্ত গড়ে তোলার মধ্যে কতখানি উত্তেজনা কতখানি আনন্দ আছে, অয়স্কান্ত বকশী তা জানতে পারলেন। কিছু দিনের মধ্যেই কক্সবাজারের বকশী-বাড়ি কক্সবাজারের মানুষের কাছে আপন জিনিস হয়ে দাঁড়াল। কক্স-বাজারের যাবতীয় মানুষের আপদ বিপদের সঙ্গে অয়স্কান্ত বকশী প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করতে লাগলেন।

"কেন তখন ওরকম খেপে উঠেছিলাম, বলতে পারেন?"

হঠাৎ আমায় জিজ্ঞাসা করলেন বকশী মশাই। বেশ একটু চমকে উঠলাম, তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাকালাম অন্ধকার কোণটায়, কিছুই নজরে পড়ল না। রাতের খাওয়া হয়ে গেলে শোনাতে শুরু করতেন তিনি অয়স্কান্তের ইতিহাস, ডেক চেয়ারে তলিয়ে থাকত তাঁর দেহ যষ্টিখানি, খুব কাছে আর একটা চেয়ারে সোজা হয়ে বসে সন্তর্পণে আমি কান পেতে থাকতাম। অস্বাভাবিক স্বর, অনেক দূর থেকে অনেক কাল আগে থেকে ভেসে আসত। সত্যি মনে হত, বহু কাল আগে বহু দূরে বসে কে আওড়ে গেছে কাহিনীটা, ব্যবধানটা পেরিয়ে আসতে আসতে সুরটা অমন মরমর হয়ে পড়েছে। পাশে শোয়া একটা

জ্যান্ত মানুষের মুখ থেকে কিছু শুনছি বলে মনেই হত না।

সেদিন আবার ডেকের ওপর ছিলাম না আমরা, বিকেল থেকে বৃষ্টি শুরু হয়েছিল বলে বসবার ঘরে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। একটি মাত্র নিবিড় নীল আলো জ্বলছিল ঘরে, মাঝে মাঝে সমুদ্রের হিসহিসানি ঘরের ভেতরটা খুব আলগোছে ছুঁয়ে যাচ্ছিল। ঘরের কোণে একটা গদি আঁটা চেয়ারে আড় হয়ে পড়েছিলেন বকশী মশাই, আমি বসেছিলাম একটু তফাতে টেবিলের ধারে। ডান হাতের কনুইটা টেবিলের কিনারায় ঠেকিয়ে হাতের চেটোয় মাথাটার ভর রেখে চোখ বুজে শুনে যাচ্ছিলাম। আচম্বিতে তাল কেটে গেল। সোজা হয়ে বসে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাকালাম অন্ধকার কোণাটায়, মনে হল বকশী মশাই যেন খাড়া হয়ে উঠে বসেছেন। তটস্থ হয়ে উঠলাম, এ আবার কি ব্যাপার! হঠাৎ আবার আমায় প্রশ্ন করা হচ্ছে কেন? শুনতে হবে শুনছি। শোনাতে হবে শোনাচ্ছেন। মাঝখানে আবার অন্য সুর আমদানি হচ্ছে কেন!

নতুন সুরে একেবারে নতুন কায়দায় কাছের মানুষ বকশী মশাই খুব কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করলেন—"একটা মেয়ের জন্যে একটা পুরুষ খেপে ওঠে কেন জানেন?"

সমুদ্রের বুকে দোলা লাগল। বেশ আলতো ভাবে নাচতে লাগল তরণীখানি। অয়স্কান্ত আবার একটা অতি অদ্ভুত কাণ্ড শোনাতে শুরু করলেন। আবার তিনি আড় হয়ে পড়লেন সোফার কোণায়, আবার সেই অনেক তফাত থেকে বলা কাহিনীটা ঘ্যানঘ্যান করে চলতে লাগল। এতটুকু উৎসাহ উত্তাপ উৎকণ্ঠা নেই সেই সুরে। থাকতে পারেও না, ইতিহাস যে, ইতিহাসে হৃদয়ের ছোঁয়া লাগলে ইতিহাস উচ্ছিষ্ট হয়ে যায়। নির্ভেজাল নিরপেক্ষতা রূপে ঐতিহাসিক ঐশ্বর্য বজায় থাকে না।

ডাক্তার ধূর্জটিনাথ চৌধুরী জীবন রহস্য উদ্‌ঘাটনের বাসনায় বনজঙ্গল চুঁড়ে যত রকমের কেউটে গোখরো পেলেন, ধরে এনে খাঁচায় পুরতে লাগলেন। বকশী-বাড়ির বাগানর মধ্যে খুব বড় একটা ঘর বানাতে হল সাপেদের জন্যে, কাঁচ তারের জাল দিয়ে ঘরখানাকে ঘিরতে হল। এল সব বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, সাপের বিষ থেকে প্রাণ নামক বস্তুটাকে আলাদা করে ফেলবার জন্যে প্রাণান্তকর কাণ্ডকারখানা শুরু হয়ে গেল। দিবারাত্র স্ত্রীটিকে নিয়ে সেই সাপেদের ঘরে বন্ধ হয়ে রইলেন ডাক্তার চৌধুরী, স্ত্রীকে জ্যান্ত কেউটে গোখরো ধরবার কায়দা শেখাতে লাগলেন। সাপের মাথাটা ধরে কি করে বিষটুকু নিঙড়ে বার করতে হয়, শিখে ফেললে অনুপমা, কয়েকটা সাপকে বেশ পোষ মানিয়েও ফেললে। ক্রমে ক্রমে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে গেল। অনুপমার চক্ষু দুটির

দিকে তাকালে কেমন যেন গা ছমছম করে উঠে। ঠিক যেন সাপের চাউনি, মানুষের চোখে সাপের চাউনি ফুটতে লাগল আস্তে আস্তে। ডাক্তার চৌধুরীর অবসর হল না স্ত্রীর চোখের পানে তাকাবার, তিনি তাঁর জীবনরহস্য নিয়ে জীবন পাত করতে লাগলেন।

অয়স্কান্ত আর বনলতার সবটুকু অবসর ওধারে বকশী-বাড়ির বাইরে বাইরে কাটতে লাগল। ইতিমধ্যে খাড়া হয়ে গেছে এক প্রসূতিসদন। ভয় দেখিয়ে, ঘুষ দিয়ে, খোশামুদি করে প্রসূতিদের কেড়ে আনা হচ্ছে মগেদের ঘর থেকে, তাদের ওঝাবৈদ্যরা মন্ত্র পড়ে প্রসূতি আর সদ্যপ্রসূতদের ঘাড় থেকে ভূত তাড়াবার সুযোগ পাচ্ছে না। ঘরে ঘরে বনলতাকে দেবী হিসেবে পূজা করতে শুরু করেছে সকলে। করবে না কেন, অষ্টপ্রহর না খেয়ে না ঘুমিয়ে টো টো করে ঘুরে বেড়ালেও যে মানুষের মুখের হাসিটি নিভে যায় না, তাকে দেবী বলে ডাকতে কার না সাধ হয়। কিন্তু দেবীর সামর্থ্যের একটা সীমা আছে, সেই সীমা পার হয়ে দেবীর শরীর ভেঙে পড়ল। অয়স্কান্ত তখন দেবীকে নিয়ে জাহাজে চড়ে সমুদ্রে ভাসতে লাগলেন।

"এই সেই জাহাজ—"

সোজা হয়ে বসলেন বকশী মশাই, আবার তাঁর কথাগুলোকে জ্যান্ত মানুষের কথার মত বোধ হতে লাগল। ফিসফিস করে বলতে লাগলেন—"আমি তাকে বিয়ে করেছিলাম এই জাহাজের ওপর। এই জাহাজের কাপ্তেন সাহেব বিয়ের মন্ত্র পড়িয়েছিল, সাক্ষী ছিল জাহাজের সবকটি সারেং খালাসী। কোন ভাষায় বিয়ের মন্ত্র পাঠ করেছিলাম আমরা, কোন ধর্মমত অনুযায়ী বিয়ে হয়েছিল, তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। জাহাজের কাপ্তেন সাহেব বিয়ের মন্ত্র পড়াতে পারে, সমাধি দেবার মন্ত্র পড়াতে পারে, বিচার করে শাস্তি দিতে পারে। সমুদ্রের বুকে জাহাজের কাপ্তেনই হল সব, একাধারে পুরুত প্রতিপালক দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। সুতরাং বিবাহটা আমাদের দস্তুরমত আইনসিদ্ধ বিবাহ হয়েছিল। হয়েছিল কি না, জিজ্ঞাসা করুন ঐ সমুদ্রকে। ঐ সমুদ্র সাক্ষী আছে, সমুদ্র আজও মরে নি, সমুদ্র এখনও—ঐ দেখুন—আথালিপাথালি করছে।"

চমকে উঠলাম একটু, হাঁ তা করছে। ঘরের দরজা বন্ধ, স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, বড্ড বেশী দুলুনি হচ্ছে। টেবিলের কিনারাটা কতক্ষণ দু হাতে আঁকড়ে ধরে বসে আছি, খেয়াল করতে পারলাম না। আবার সাবধান হতে হল, চেয়ারখানাকে একটু পিছিয়ে নিলাম একটা থামের পাশে। মুঠোর মধ্যে ধরা যায়, এমন মোটা কয়েকটা থামের ওপর ছিল ছাতটা। থামগুলো বোধ হয় রুপোর পাতে মোড়া, রুপোর মত ঝক্‌ঝক্‌ করছিল। থামটাকে বাগিয়ে ধরে

বকশী মশায়ের পানে তাকিয়ে রইলাম।

বকশী মশাই বেশ কিছুটা সময় চোখ বুজে রইলেন, মনের মধ্যে গুছিয়ে নিতে লাগলেন বোধ হয় তাঁর বক্তব্য। তার পর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ মেললেন। অল্প একটু হাসির আওয়াজ হল। হাসলে গলার আওয়াজ হালকা হয়ে পড়ে, হালকা সুরে বলতে লাগলেন—"না থাক, আপনি আবার গেরুয়া-ধারী, আপনার সামনে তার পরের ব্যাপারগুলো বলে লাভ নেই। তা ছাড়া বনলতাকে আপনি দেখেন নি, আপনি আন্দাজ করতেই পারবেন না কি ছিল সেই দেহটুকুর মধ্যে। পাগল হয়ে উঠলাম আমি, উঃ! সে কি নেশা!"

স্তব্ধ হয়ে পড়লেন বকশী মশাই। বুঝলাম, ও'র বয়স ও'র অভিজ্ঞতা সর্বোপরে ওঁর পরিণত রুচি এবার বাধা দিচ্ছে, বনলতার ব্যাখ্যা নিয়ে আর বেশী দূর এগোতে উনি পারবেন না।

ঠিক তাই হল, আস্তে আস্তে আবার সেই আগেকার মরা সুর ফুটে উঠল ওঁর কণ্ঠে। এলিয়ে গেল কথাগুলো, ছাড়ো ছাড়ো ভাবে বলতে লাগলেন— "আমার স্ত্রীকে নিয়ে চলে গেলাম চাটগাঁ, শ্বশুরবাড়িতে পেঁছে পুরুত ডাকিয়ে নতুন করে মন্ত্র পড়া হল, আগুন জ্বালিয়ে খই পোড়ানো হল। শাস্ত্রীয় আচার অনুষ্ঠান নিখুঁত ভাবে সম্পন্ন করে আবার আমরা জাহাজে উঠলাম। তাই তো প্রথম দিন আপনার সামনে আপনার সেই ঘোষাল মশায়ের নাতজামাইটিকে শালা বলে ফেলেছিলাম। ঘোষাল মশায়ের নাতজামাইটি যত বড় মানুষের নাতজামাই হন না কেন, আসলে তিনি একটি শালা। কারণ তার দিদিটিকে আমি যথাশাস্ত্র বিবাহ করেছিলাম।"

নাতজামাইটির রূপ আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। আন্দাজ করার চেষ্টা করলাম, তার বোন বনলতার মূর্তিখানি কেমন ধারা হতে পারে। ভাই-বোনের আকৃতি অনেক ক্ষেত্রে এক রকমের হয়, খানিকটা আদল থাকেই। ছিলও, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। নয় তো অয়স্কান্ত পাগল হতে গেলেন কেন? ভাইটির সঙ্গে কয়েক ঘণ্টা কাটিয়েছিলাম। সেই দুষ্টুমি ভরা চোখ দুটিকে ভুলতে পারি নি। বউটিকে নিয়ে সকলের নজরের আড়ালে গিয়ে এমন ফ্যাসাদ বাধিয়ে বসলেন যে আদিনাথ দর্শনটাই মাথায় উঠে গেল। ওর বোন আর কত ভাল হবে!

অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। বকশী মশায়ের কথা কানে যেতে আবার তটস্থ হয়ে উঠলাম। বকশী মশাই মন্ত্র পড়ার মত করে বলতে লাগলেন—"এই সমুদ্র, এই সমুদ্রের বুকে তাকে বিয়ে করেছিলাম, এই সমুদ্রের বুকে তাকে বিসর্জন দিলাম। মানুষের আইন প্রেতের আইন এক নয়। প্রেতের সঙ্গে মানুষের বিয়ে হতে পারে না। সে চলে গেছে, সে এই সমুদ্রের বুকে আমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে। যে অদৃশ্য শত্রু সইতে পারলে না আমাদের মিলন,

তাকে আমি বাধা দিতে পারি নি। তাই আমার স্ত্রীকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। যাক, এবার সময় হয়ে এসেছে। এবার আমি দেখে নোব, কার কতখানি ক্ষমতা আছে, দেখতে হবে এবার আমাকে। চামড়া ঢাকা কয়েকখানা হাড়ের মায়ায় খুব দগ্ধে মলাম! দগ্ধানির শেষ হল। আচ্ছা—"

বলতে বলতে দাঁড়িয়ে উঠলেন বকশী মশাই। উঠে তিন বার হাততালি দিলেন। পাগড়ি তকমা পরা দাড়িওয়ালা এক খিদমদগার নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে নিঃশব্দে এক সেলাম ঠুকলে। বকশী মশাই খুব সংক্ষেপে তাকে হুকুম প্রদান করে আমায় বললেন—"যান, অনেক রাত্রি হল। শুয়ে পড়ুন গিয়ে এখন। বাকী-টুকু কাল জানতে পারবেন।"

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবার আগে কেন জানি না, এক বার মুখ ফিরিয়ে-ছিলাম। ঘরের কোণায় দাঁড়িয়ে ছিলেন বকশী মশাই, অন্ধকারে চোখ মুখ দেখা গেল না। কিন্তু একটা খুব ছেলেমানুষী ধারণা হয়ে গেল আমার হঠাৎ। লম্বা দেহটাকে রক্ত-মাংসের দেহ বলে মনে হল না। যেন ছায়া দিয়ে গড়া কায়া, যেন—

ঐধারণাটা মাথায় নিয়ে কেবিনে ঢুকে শুয়ে পড়লাম। রাত্রে ভাল ঘুম হল না। যত বার একটু ঘুম আসে, তত বার চমকে উঠি। ছায়া দিয়ে গড়া অয়স্কান্ত বকশীর সঙ্গে সঙ্গে চলেছি যেন কোথায়। এমন বিশ্রী পথে চলেছি, যে পথে পায়ের তলায় ছায়া ছাড়া কিছুই ঠেকে না। ছায়াপথে চলতে চলতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

॥ পাঁচ ॥

সেই ছায়াপথে আজও চলেছি।

অয়স্কান্ত বকশী এখনও আমার সঙ্গে রয়েছেন। একটু অন্যমনস্ক হলেই তাঁর সেই শীর্ণ মূর্তিটি আমার সামনে উদয় হয়। তাঁর সেই কোটরে বসা চক্ষু দুটির অতি অস্বাভাবিক চাউনি বোবা ভাষায় আমায় জিজ্ঞাসা করে—প্রাণ কাকে বলে জান? জীবন কাকে বলে তা বুঝতে পেরেছ? সূতিকাগার থেকে যাত্রা শুরু করে শ্মশান পর্যন্ত পৌঁছতে যে সময়টা লাগে, তারই নামই কি জীবন? না, জীবন বলতে আরও কিছু আছে? দেহটা যদি না থাকে, তাহলে যা থাকে, তার কি বিনাশ হয় কখনও?

একের পর এক প্রশ্ন করে চলেন অয়স্কান্ত বকশী, একটারও জবাব দিতে পারি না। কি করে দোব জবাব! জীবন-মৃত্যুর নাগরদোলায় চেপে অনাদি অনন্ত এক দুর্গম পন্থায় অবিরাম ঘুরপাক খেয়ে মরছি যে, এই ঘুরপাকের খপ্পর থেকে নিষ্কৃতি না পেলে কি করে জানব জীবন-মৃত্যুর অর্থ! কি জবাব

দোব অয়স্কান্ত বকশীকে!

জাহাজের কাপ্তেনকে বকশী মশাই আদেশ দিয়ে যান, যেখানে আমি বলব সেখানে নিয়ে গিয়ে নামিয়ে দেবার জন্যে। কক্সবাজারেই ফিরে যেতে চাইলাম। অনুপমা আর তাঁর সেই ডাক্তার স্বামীটির সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করার শখ ছিল। তাই আবার কক্সবাজারেই ফিরে গিয়েছিলাম।

ফিরে গিয়ে কি জানতে পেরেছিলাম, তা পরে বলছি। আগে বকশী মশায়ের চিঠিখানির কথা বলে নিই। নয় তো বকশী মশায়ের শেষের পরিচয়টা অসমাপ্ত থেকে যাবে।

ঐ আবার ভুল করে মলাম!

শেষের পরিচয় আবার কি! পরিচয়ের কি শেষ আছে কোথাও! বকশী মশাই যেখানে দাঁড়ি টেনেছিলেন, সেখান থেকে যা শুরু হল, তা তো আমার জানা নেই। যাক্, ঐ দাঁড়ি টানা পর্যন্ত আগে বলে নিই।

পরদিন সকালে যথারীতি জাহাজী কর্তব্যগুলো সম্পাদন করে চায়ের টেবিলে হাজির হলাম। জাহাজী শিষ্টাচারে বলে, চায়ের টেবিলে বসে প্রাতরাশ না করলে মস্ত বড় অপরাধ করা হয়। সেইখানেই রোজ বকশী মশায়ের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হত। সেদিন হল না। তাঁর বদলে খামে বন্ধ একখানি চিঠির সাক্ষাৎ পেলাম। বড় খানসামা খুব বড় এক সেলাম ঠুকে চিঠিখানি আমার হাতে দিয়ে পিছিয়ে গিয়ে অন্তর্ধান করল। চিঠিখানি হাতে নিয়ে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিলাম। তাড়াহুড়ো করে চিঠি খুলতে গেলে জাহাজী মর্যাদার গায়ে চোট লাগতে পারে।

অনেকক্ষণ পরে নিজের কেবিনে ঢুকে খাম খুলে চিঠি পড়লাম।

চিঠিতে যা ছিল তা এই—

প্রীতিভাজনেষু,

সময় আর বেশী নেই। যেখানে এক দিন বনলতাকে নামিয়ে দিয়েছিলাম সমুদ্রের বুকে, সেখানে জাহাজ পেঁছিবে ভোর বেলায়। তাড়াতাড়ি আপনাকে চিঠি লিখতে হচ্ছে। অনেক কথা বলার ছিল, বলা হল না। বনলতা বহু দিন অপেক্ষা করে আছে আমার জন্যে, তাড়াতাড়ি তার কাছে পেঁছিতে চাই।

একলা তাকে ছেড়ে দেওয়াটা খুবই অন্যায় হয়ে গিয়েছিল। এই হাড়-মাংসের যন্ত্রখানা ছেড়ে তার সঙ্গে চলে গেলেই পারতাম। যাওয়াটা হয়ে ওঠে নি তখন অন্য কারণে, এই বেয়াড়া যন্ত্রখানার ওপর মায়ার জন্যে যেতে পারি নি, এ কথা মনে করলে ভুল হবে। এই যন্ত্রখানা যে কার, সেটাই যে এ পর্যন্ত ঠিক হল না।

মায়ের পেট থেকে যে মানুষটা এই যন্ত্রখানা নিয়ে দুনিয়ার বুকে পা দিয়েছিল, সে কোথায়! কে এখন এটার মধ্যে বাস করছে! এই যন্ত্রটার প্রকৃত মালিকেরই যখন ঠিক নেই, তখন এটাকে ছেড়ে যেতে মায়া হবে কেন!

মায়ার হেতু হল সেই অনুপমা, বনলতাকে সমুদ্রের বুকে নামিয়ে দিয়ে অনুপমার জন্যে কক্সবাজারের বকশী-বাড়িতে ফিরে গিয়েছিলাম। কিন্তু অনুপমাকে ছুঁতে পারি নি। ঐ একই কাণ্ড, এই দেহখানার মধ্যে যতক্ষণ আছি, ততক্ষণ মানুষের মত আচরণ করতে পারব না। দেহটা আমার নয় কি না, ঐ এক কথা।

দেহহীন এক অদৃশ্য শত্রু বনলতাকে নিঙড়ে পাকিয়ে আমার চোখের সামনে ছিবড়ে করে ছেড়ে দিয়েছিল। অসহায় ভাবে আমি তাকিয়ে ছিলাম, বাধা দিতে পারি নি। দেহহীন শত্রুর সঙ্গে দেহটা নিয়ে লড়াই করা যায় না। বনলতা আমার স্ত্রী, স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর কোনও সম্বন্ধ থাকবে না। কারণ অদৃশ্য শত্রু পাহারা দিচ্ছে।

আপনিও প্রথম দিন অসহায়ভাবে তাকিয়ে ছিলেন এই দেহটার পানে, দেহটাকে নিঙড়ে নিঙড়ে রস বার করছিল সেই অদৃশ্য শত্রু, আপনিও বাধা দিতে পারেন নি।

অনুপমা সাধ্বী থেকে গেল। কারণ এই শরীরটার মধ্যে যতক্ষণ আমি আছি, ততক্ষণ আমি কিছুই করতে পারি না। অনুপমা তাই বেঁচে গেল।

জীবনটা কি ব্যাপার বোঝবার জন্যে, বিষ নিয়ে নানা রকম পরীক্ষা চালাচ্ছিল ওর স্বামী। সে লোকটার ধারণা হয়ে গিয়েছিল, বিষের মধ্যে প্রাণ আছে। যে বিষ প্রাণ সংহার করে সেই বিষ প্রাণ দিতেও পারে। বিষের মধ্যে যে শক্তিটা আছে, সেটাকে আলাদা করে বার করতে পারলেই প্রাণ বস্তুটাকে ধরা যাবে, এই ধারণায় বিষ নিয়ে সে মেতে উঠেছিল। ফলে পাগল হয়ে যায়। তাই তাকে শিকল বেঁধে আটকে রাখতে হয়। যে ঘরে তাকে আটকে রাখা হয়, সে ঘরে আমার সঙ্গে আপনি গিয়েছিলেন। অনুপমা ওর স্বামীকে মুক্ত করে নিয়ে পালাল। পালাল কেন বলতে পারেন? একটিবার আমায় বললেই তো পারত, আমি কি ওদের আটকে রেখেছিলাম!

আমাকে মুক্তি দেবার ব্যবস্থাটাও ভাল মত করে গিয়েছিল সে কামিকেউটে দুটোকে ছেড়ে দিয়ে। খুব ভাল কাজ করেছিল। সত্যিই আমি কি করতে পারি যতক্ষণ না এই দেহটা থেকে ছাড়া পাচ্ছি! অনুপমার ইঙ্গিতটা আমি বুঝেছিলাম। তাই মুক্তি পাবার ব্যবস্থাটা তাড়াতাড়ি করে ফেললাম। আর সময় নেই। জাহাজ ঠিক জায়গায় পৌঁছে থেমেছে। সমুদ্রটা ভয়ানক গোলমাল করছে। ভোর হয়ে আসছে।

আবার যাত্রা শুরু হবে আমার, এবার আর একলা নই। আমার স্ত্রী বনলতা

আমার সঙ্গে থাকবে। আর ভয় নেই।

পথ কিন্তু বড়ই দুর্গম, একটা দুর্গম পথ ছেড়ে আর একটায় পা বাড়াচ্ছি।

যেখানে আপনি যেতে চাইবেন, এই জাহাজ সেখানে নিয়ে যাবে। এবারের মত এইখানে বিদায়। ইতি

কক্সবাজারে আবার উদয় হলাম।

জাহাজ যেদিন ছেড়ে যায়, সেদিন খুব স্পষ্ট ভাবে এক জনকে দেখেছিলাম একটা গুদামের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকতে। মুখের ওপর তার আবরণ ছিল না। চিনতে আমার ভুল হয় নি। তাই কক্সবাজারেই ফিরে গেলাম।

বড় শখ ছিল সেই অনুপম আঁখি দুটির অতল তলে কি ডুবে আছে তা জানবার। অন্তঃসলিলা অনুপমার অন্তরের মধ্যে একটু উঁকি দেবার বড় শখ ছিল। জীবনরহস্য মৃত্যুরহস্য প্রাণরহস্য, কোনও রহস্যের পেছনে ধাওয়া করার বিন্দু মাত্র গরজ সেদিনও ছিল না আমার মগজে, আজও নেই। তবে দৃষ্টিরহস্যের লোভটা সম্বরণ করতে পারি না। ঐটুকুই আমায় খেয়েছে। দৃষ্টিরহস্যের পেছনে ধাওয়া করে কোথায় না ছুটে মরেছি! আজও ঐ এক রোগের দরুন ছুটোছুটি করে মরছি। ছুটোছুটির আর শেষ হল না।

কক্সবাজারে নেমে ওদের পেলাম না। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত একটি সমাচার শ্রবণ করলাম। পাগলা ডাক্তারটা তার স্ত্রীকে খুন করে কোথায় ফেরার হয়ে গেছে। যাবার সময় স্ত্রীর চক্ষু দুটিকে অতি সুচারু রূপে উপড়ে নিয়ে গেছে। খুনীটাকে খুঁজে বের করবার গরজ নেই কারও, কক্সবাজারের মানুষে কোনও রহস্যের ধার ধারে না।

তার পর আবার ঘুরছি। পন্থা অতি দুর্গম, ঠিকানা জানি না। কেন ঘুরছি এই দুর্গম পন্থায়, তাও জানি না। ঘুরছি, ঘুরে মরছি, এ ঘোরার শেষ কোথায় কে বলে দেবে!

যিনি তা জানাতে পারেন, সেই সর্বব্যাপিনী চিন্ময়ী শক্তির প্রণাম মন্ত্রটুকুই শুধু জানি—

ইন্দ্রিয়াণামধিষ্ঠাত্রী ভূতানাঞ্চাখিলেষু যা।
ভূতেষু সততং তস্যৈ ব্যাপ্তিদেব্যৈ নমোনমঃ॥